আমার বাল্যকথা

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউট
৪, এলগিন রোড,
কলকাতা-২০

আমার বাল্যকথা

রবীন্দ্র প্রসঙ্গ গ্রন্থমালা — ২য় সংস্করণ

প্রকাশকাল — ১৩৬৭,

বৈতানিক প্রকাশনীর
পক্ষে সোমেন্দ্রনাথ বসু
কর্তৃক প্রকাশিত ও
লোক-সেবক প্রেস
৮৬-এ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড
হইতে মুদ্রিত।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার রেনেসাঁর একটি স্মরণীয় নাম। নারীর জীবনকে বন্ধনমুক্ত করে তাকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে যাঁরা সমস্ত সামাজিক প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে কাজ করে গেছেন রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পরে তাঁদের অন্যতম হচ্ছেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন প্রথম ভারতীয় আই-সি-এস। কিন্তু আই-সি-এস বলতে যে ধরণের লোক আমাদের মনের চোখে ভেসে ওঠে সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা জাতের মানুষ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় ও সাহায্যে যে হিন্দুমেলা ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় সেই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সে যুগের মনীষী ব্যক্তিরা—রাজনারায়ণ বসু, অক্ষয় দত্ত, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি যুক্ত ছিলেন। হিন্দুমেলাই হচ্ছে জাতীয়তাবোধ উন্মেষ করবার প্রথম প্রচেষ্টা আমাদের দেশে। এই হিন্দুমেলায় সত্যেন্দ্রনাথ রচিত 'গাও ভারতের জয়, হোক ভারতের জয়' গানটি গীত হয়। এই গানটি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গ-দর্শনে লেখেন "সত্যেন্দ্রবাবু আর কিছু লিখুন বা না-ই লিখুন এই গানটিতে তিনি বঙ্গসাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবেন। এই মহাগীত ভারতের সর্বত্র গীত হউক। হিমালয়-কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক। গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, গোদাবরী তটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্মরিত হউক। পূর্ব-পশ্চিম সাগরের গভীর গর্জনে মন্ত্রীভূত হউক। এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক।"

সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন তেজস্বী, সত্যসন্ধ দেশপ্রেমিক পুরুষ। তাঁর কর্মজীবন বাংলার বাইরে মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে অতিবাহিত হয়। মহারাষ্ট্রের মহামতি রাণাডে ও গুজরাটের ভোলানাথ সারাভাই প্রভৃতি চিন্তানায়ক ও সমাজ সংস্কারকেরা তাঁর বন্ধু। বাংলার নব-জাগৃতি আন্দোলনের সঙ্গে মহারাষ্ট্রের ও গুজরাটের নব-জাগরণের সংযোগ স্থাপনের মিলন সেতু ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ।

ছেলেবেলায় আমরা বাবামহাশয়ের কাছে বড় ঘেঁসতাম না। তিনি কখনও আমাদের ডেকে ইংরেজি বাঙলায় পরীক্ষা করতেন আর কখনও বা তাঁর মজলিসে গিয়ে আমরা চুপটি করে বসে থাকতুম। আমাদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ব্রাহ্মধর্ম শিক্ষার বেলায়। ব্রাহ্মধর্ম পড়াবার ভার তিনি নিজের হাতে নিয়েছিলেন। তা ছাড়া প্রত্যহ আমাদের পারিবারিক উপাসনা হত, তাতে আমরা সকলে যোগ দিতুম। আমি মুখে মুখে প্রার্থনা আবৃত্তি করতুম। একটি স্তোত্রমালার পুস্তকে কতকগুলি ভাল স্তবস্তোত্র সন্নিবিষ্ট ছিল, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু আরও অন্য কার কারও বিরচিত। তার প্রায় সকলগুলিই আমার কণ্ঠস্থ ছিল। ফরাসী ব্রহ্মবাদী Fenelon হতে অনুবাদিত যে প্রার্থনাটি মহর্ষির আত্মজীবনীতে দেওয়া হয়েছে সেটিও তার মধ্যে ছিল। অক্ষয়কুমার দত্তের একটি প্রার্থনা ছিল তা এখনো কিছু কিছু স্মরণ আছে। তাঁর ভাষার বিশেষত্ব তা হতে স্পষ্ট ফুটে বেরচ্ছে। আরম্ভ এই—

"হে ধ্রুবসত্য সনাতন! কালসহকারে কত বিষয়ের কত প্রকার পরিবর্তন হইতেছে, কিন্তু তোমার অপরিবর্তনীয় অপার কারুণ্য-স্বরূপের কদাচ পরিবর্তন নাই। নদীর প্রবাহ পরিবর্তিত হইতেছে, নগর সকল পুরাতন হইতেছে, রাজ্য ও রাজা বিনষ্ট হইতেছে, মাস ও পক্ষ অতীত হইতেছে, শীত ও বসন্ত গমনাগমন করিতেছে, বাল্য যৌবন তড়িৎ সমান তিরোহিত হইতেছে, কাল ও মৃত্যু নিরন্তর ক্রীড়া করিয়া চরাচর শাসন করিতেছে কিন্তু তোমার সেই কারুণ্য-স্বরূপের কোন পরিবর্তন নাই, ইত্যাদি।"

তখন ১১ই মাঘের উৎসব খুব ধুমধামে সম্পন্ন হত। বিস্তর লোকজনের সমাগম আর রাত্রে এক বৃহৎ বৈঠকী ভোজ। তাতে আমরাও যোগ দিতুম। সেই একদিন যেদিন ছোট বড়র কোন প্রভেদ থাকত না। ঐ উপলক্ষে একবার একদল মিলে পলতার বাগানে গিয়ে বড়ই আমোদ আহ্লাদ করা গিয়েছিল; সেদিনের ব্যাপার আমার বেশ মনে পড়ে। ভোজের কর্মকর্তা ছিলেন জগমোহন গাঙ্গুলী। লোকটি বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ—তাঁর ভুঁড়িটিও অতুলনীয়। এমন সৌখান আমুদে অথচ কর্মিষ্ঠ মানুষ আমি কখনও দেখিনি। খাওয়া, পরা, ওঠা, বসা, প্রত্যেক কার্যে তাঁর কারিগরি প্রকাশ পেত। রান্না বান্না ঘর কন্না—পোষাক সাজ সজ্জা, কারুকার্য, ছুতরের কামারের কাজ—সকল কর্মেই তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। আমরা ছেলের দল তাঁর বড় নেওটা ছিলুম—তাঁর ঘরে গিয়ে খেলা করতুম,—তাঁর কাছে গল্প শুনতুম; তাঁর খুঁটিনাটি অসংখ্য জিনিষের মধ্যে কোনওটা আবদার করে আদায় করতুম;—তাঁর মুখের পান কি মিষ্টি লাগত! তিনি আমাকে উর্দুর প্রথম কেতাব "চাহার দরবেস" শেখাতেন—"সুভান আল্লা ক্যা সানে হ্যায় কি জিসনে এক মট্টি খাকসে ক্যা ক্যা স্থরতে আওর মিট্টিকি মূরতে পয়দা কিয়া।"

তাঁর ভুঁড়িটি আমাদের আদরের সামগ্রী ছিল আর তিনি সকালে যে নাকডাকানী গম্ভীর আওয়াজে দিগ্বিদিক ধ্বনিত করতেন আমরা ভোরে উঠে তাই শুনতে যেতুম। তিনি এক-প্রকার আমাদের বাড়ীর দ্বারপাল ছিলেন। একবার একদল পুলিস ওয়ারেণ্ট নিয়ে এসে বলপূর্বক আমাদের এক গাড়ী টেনে নিয়ে যাবার যোগাড় করছিল—তিনি একলা সেই গাড়ী ধরে রেখে তাদের হটিয়ে দিয়েছিলেন—এ আমার স্বচক্ষে দেখা। আমাদের জগমোহন সেকালের রামমূর্তি।

সেই গাঙ্গুলীমশায় পলতার বাগানে আমাদের বনভোজনের

আহার সামগ্রী প্রস্তুত করলেন—সে মাছের ঝোল ভাত আর ভুলব না! আমাদের বাহনগুলি সারি সারি চলেছে—৮।১০টা বোট—আমরা রাত্রিশেষে পলতার বাগানে দলবলে গিয়ে উপনীত হলুম। বোটে আমাদের বিদূষক ছিলেন নবীনবাবু; তাঁর হাস্যপরিহাসে সন্ধ্যাটা খুব আমোদে কেটে গেল। তাঁর বিদ্রূপের বাণ বিশেষরূপে যাঁর উপর প্রয়োগ করা হচ্ছিল সে লোকটি বে—বাবু। আমি তাকে হাবু বলব। বাবু শব্দের নবীনবাবু এক ছড়া বেঁধেছিলেন তা হাবুবাবুতে বেশ খেটে যায়—

বাববো বহবঃ সন্তি বাবুয়ানা পরায়ণা
হাবুবাবু সমো বাবু ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।

তিনি একজন কষ্টপ্রধান লোক—ঠাণ্ডার ভয়ে গলায় সালের গলাবন্ধ ও গায়ে গরম কাপড় জড়িয়ে মুড়িসুড়ি দিয়ে বসে ঝিমচ্ছেন। বোটের ভিতর একপাশে একটা ছোট কাচের আলমারী ছিল। নবীনবাবু যখন হাবুর প্রতি লক্ষ্য করে গম্ভীর ভাবে প্রস্তাব করলেন যে ঐ কাপড়ের পার্সেলখানা তুলোয় জড়িয়ে এই গ্লাসকেসে পুরে রাখলে ভাল হয়, তখন আমাদের হাসির ফোয়ারা ছুটে গেল। পলতায় নেমে আমরা দলে দলে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়লুম। প্রধান দুইদল—একদল চড়ুইভাতী রান্নার চারিদিকে অন্য দলের কেন্দ্র হচ্ছেন—চাটুয্যেমশায়। ভবিষ্যতে তিনি আমাদের একজন পরম আত্মীয়ের মধ্যে গণ্য হলেন। সে সময়ে তাঁর বয়স হয়ত ৪০ পেরিয়ে থাকবে কিন্তু বালকের মত তাঁর ভাবভঙ্গী উৎসাহ কলরব, নৃত্যগীত লীলাখেলায় আমাদের সকলকে মাতিয়ে তুললেন। তাঁর তখনকার গান মনে পড়ছে—

ব্যাটাছেলের (মুখে)* কড়ি সর্বলোকে কয়,
সাহসের কার্যে ব্যাটাছেলের পরিচয়।

---

* কথাটির সামান্য একটি অক্ষর বদল করিলাম।

কলম্বস নাবিক ছিল, সাহসে আমেরিকা গেল,
দেশের বার্তা জেনে শেষে দেশটি করলে জয়।
ব্যাটাছেলে হবে যদি, সাহস কর আজ অবধি,
বিধবা বিবাহে কর আনন্দ উদয়।

উপরে আমি পারিবারিক উপাসনার কথা উল্লেখ করেছি। কোন কোন দিন উপাসনান্তে বাবামশায় আমাদের উপদেশ দিতেন। আমাদের যা কিছু দোষ দেখতেন কোন কোন দিন উপদেশে তার উল্লেখ করে শুধরে দেবার চেষ্টা করতেন। আমি যখন বিলেত থেকে ফিরে এসে ইংরিজি রকম চাল চলনের বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছিলুম তখন তিনি একদিন দালানে উপাসনার সময় ইংরাজি রীতি-নীতির অন্ধ অনুকরণ—অতিরিক্ত সাহেবিয়ানার বিরুদ্ধে তীব্র ভর্ৎসনা সহকারে আমায় সাবধান করে দিয়েছিলেন—সে উপদেশটি আমার মনে চিরমুদ্রিত থাকবে। বিলেতে থাকতে আমি তাঁকে একবার নাচ-মজলিসে বিবিসাহেবের একসঙ্গে নৃত্য বর্ণনা করে পত্র লিখে-ছিলুম—তিনি তার উত্তরে বলেছিলেন যেন আমি সেই রাক্ষসী মায়ায় মত্ত হয়ে লক্ষ্যহারা হয়ে আমার আসল কাজ ভুলে না যাই।

বাবামহাশয় সমাজসংস্কার সম্বন্ধে Conservative ছিলেন বলেই লোকের ধারণা, কিন্তু তখনকার কালের তুলনায় তাঁকে উন্নতিশীলের মধ্যে গণ্য করাই উচিত। তাঁর জীবনের প্রথম দিকে তিনি যে-রকম সমাজসংস্কার করেছিলেন সে সময় আর কেহই সেরূপ করে-ছেন কিনা জানি না। তবে ক্রমশ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কতকটা Conservative হয়ে পড়েছিলেন; বহুদর্শনের অভিজ্ঞতায় সাবধানে পা ফেলে মাটি পরীক্ষা করে চলতে চাইতেন; কিন্তু আমার তখন নবীন বয়স—আমি ছিলুম ঘোর Radical.

এই সকল বিষয়ে আমাদের যতই মতভেদ থাক না কেন তিনি আমার স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করতেন না। অনেক দূর ইচ্ছামত চলতে দিতেন।

আমি ছেলেবেলা থেকেই স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী। মা আমাকে অনেক সময় ধমকাইতেন, "তুই মেয়েদের নিয়ে মেমদের মত গড়ের মাঠে ব্যাড়াতে যাবি নাকি?" আমাদের অন্তঃপুরে যে কয়েদখানার মত নবাবী বন্দোবস্ত ছিল তা আমার আদবে ভাল লাগিত না। আমার মনে হত এই পর্দাপ্রথা আমাদের জাতির নিজস্ব নয় মুসলমান রীতির অনুকরণ। অনুকরণ এবং মুসলমান অত্যাচার হতে আত্মরক্ষা এই দুই কারণ হতে তার উৎপত্তি হতে পারে। আমাদের প্রাচীন হিন্দু আচার অন্যতর। এই অবরোধ প্রথা আমার অনিষ্টকর কুপ্রথা বলে মনে হত। আমি গোপনে আমার এক বন্ধুকে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গিয়ে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্য কত ফন্দী করতুম এখন মনে হলে হাসি পায়। John Stuart Mill-এর Subjection of Women গ্রন্থ আমার সাধের পাঠ্য পুস্তক ছিল; আর তাই পড়ে 'স্ত্রী-স্বাধীনতা' নামে এক Pamphlet বের করে-ছিলুম। বিলেত গিয়ে আমি দেখতুম স্ত্রী পুরুষ কেমন স্বাধীনভাবে সামাজিক ক্ষেত্রে মেলামেশা করছে।—গার্হস্থ্য জীবনে তাদের মেয়ে-দের কি মোহন সুন্দর প্রভাব। কত বিবাহিতা অবিবাহিতা রমণী সমাজের বিবিধ মঙ্গলব্রতে জীবন উৎসর্গ করে স্বাধীনভাবে বিচরণ করছেন। আমি একবার একটি সম্ভ্রান্ত উচ্চ পরিবার মধ্যে অতিথি-রূপে কতিপয় দিবস যাপন করেছিলুম। গৃহে অনেকগুলি কন্যা কুমারী ছিলেন—সমস্ত গৃহকার্যে তাঁহাদেরই আধিপত্য। বিদায় নেবার সময় তাঁহাদের খাতায় স্মরণ-চিহ্ন স্বরূপ আমার হস্তাক্ষর রেখে যেতে অনুরোধ করাতে আমি লিখেছিলুম—"স্ত্রিয়ং শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন।"

তাদের তুলনায় আমাদের স্ত্রীরা পর্দার অন্ধকারে কি খর্বীকৃত বদ্ধ জীবন যাপন করেন,—উপযুক্ত ক্ষেত্রের অভাবে তাঁদের মন কি সঙ্কীর্ণ,—তাঁদের স্বাভাবিক জ্ঞানবলক্রিয়া কিছুই স্ফূর্তি পায় না। বিলেত থেকে ফিরে এসে এই বিষয়ে পূর্বপশ্চিমের পরস্পর বিপরীত ভাব

আমাদের মনে স্পষ্ট প্রতিভাত হল—পর্দা উচ্ছেদ-স্পৃহা আরও জেগে উঠল। কিন্তু তখন ভাল করে দেখতে পেলুম আমার সামনে যে পর্বত সমান বিঘ্নবাধা তা অতিক্রম করা কি কঠিন! যে প্রচণ্ড গড়ের মধ্যে আমাদের মেয়েরা আবদ্ধ, সে দুর্গ ভেদ করা কি দুরূহ ব্যাপার! অথচ আমার তা না করলেই নয়। তখন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা পাশ করে ফিরে এসেছি—বোম্বাই আমার কর্মস্থান নিয়োজিত হয়েছে—বোম্বাই যেতেই হবে, আর আমার স্ত্রীকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। স্ত্রী-স্বাধীনতার দ্বার খোলবার এক মহা সুযোগ উপস্থিত। তখন আবার কলকাতা ও বোম্বাইয়ের মধ্যে রেলপথ প্রস্তুত হয়নি—জাহাজে করে যেতে হবে। বাবামহাশয় তাতে কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। এখন কথা হচ্ছে ঘাটে উঠা যায় কি করে? গাড়ী করে ত যাওয়া চাই? আমি প্রস্তাব করলুম বাড়ী থেকেই গাড়ীতে উঠা যাক। কিন্তু বাবামহাশয় তাতে সম্মত হলেন না—বল্লেন মেয়েদের পাল্কী করে যাবার নিয়ম আছে তাই রক্ষা হোক। অসূর্য-স্পশ্যা কুলবধূ কর্মচারীর চখের সামনে দিয়ে বাহির দেউড়ি ডিঙ্গিয়ে গাড়ীতে উঠবেন, এ তাঁর কিছুতেই মনঃপূত হল না। এই ত গেল পর্দা ভাঙ্গার প্রথম অবস্থা। আমি প্রথমবার বোম্বাই থেকে বাড়ী এসে আমার স্ত্রীকে গভর্ণমেণ্ট হাউসে নিয়ে গিয়েছিলুম। সে কি মহা ব্যাপার। শত শত ইংরাজমহিলার মাঝখানে আমার স্ত্রী—সেখানে একটি মাত্র বঙ্গবালা—তখন প্রসন্নকুমার ঠাকুর জীবিত ছিলেন। তিনি ত ঘরের বৌকে প্রকাশ্যস্থলে দেখে রাগে লজ্জায় সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেলেন। এখন এসব কথা গল্পের মতই মনে হয়। এইরূপে ক্রমে স্বাধীনতার পথ সহজ ও পরিষ্কৃত হয়ে এল। ক্রমে আমাদের বাড়ীর লোকেরা (মেয়ে পুরুষ) আমার ওখানে গিয়ে মধ্যে মধ্যে প্রবাস-যাপন করতে লাগলেন। ওদেশে বোম্বাই মান্দ্রাজে কোথাও বাংলা দেশের মত মেয়েদের অবরোধ প্রথা নেই। স্ত্রী-স্বাধীনতার মুক্তবায়ু সেবন করে তাঁদের মনোভাব

অনেক পরিমাণে বদলে গেল। পর্দার উচ্ছেদ সাধন আমার যে চিরকালের সাধ তা ক্রমে মেট্‌বার মত হয়ে এল। আমি বোম্বাই থেকে ছুটির সময় মাঝে মাঝে বাড়ী আসতুম—তখন দেখি পর্দার তেমন কড়াক্কড় বাঁধুনি নেই, অনেকটা শিথিল হয়ে এসেছে। তারপর এখন!

সেকাল আর একাল—কি তফাৎ! কলকাতা সহরের ভদ্র মহিলারা রাস্তা ঘাটে গাড়ীতে মোটরে ইচ্ছামত বেড়িয়ে ব্যাড়াচ্ছেন এ দৃশ্য কারও নূতন ঠেকে না। যা কিছুকাল পূর্বে কল্পনারও অতীত ছিল এক্ষণে তা সহজ স্বাভাবিক হয়ে পড়েছে। সত্যি সত্যই অন্তঃপুরবাসিনীগণ এখন মেমের মত গড়ের মাঠে হাওয়া খেয়ে ব্যাড়াচ্ছেন। এতদিনে আমার মনস্কামনা অনেকটা পূর্ণ হয়েছে।

আমি আমার বাল্যজীবন সম্বন্ধে যে-কালের কথা পেড়েছি সে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কাল। তখন আমাদের পরিবারে ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব এক প্রকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমার স্মৃতি তারও উর্ধে অনেক দূর পর্যন্ত যায়। এবার যতটা পারি সুদূর অতীতের চিত্র অঙ্কনের চেষ্টা করব।

দ্বারকানাথ ঠাকুর

আমাকে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করেন আমার পিতামহ দ্বারকনাথ ঠাকুরকে মনে পড়ে কি না? তার উত্তরে বলতে পারি একেবারে মনে পড়ে না তা নয়, স্পষ্ট মনে পড়ে তাও নয়। একদিন তিনি আমাদের তিন ভাইকে ঘরে ডেকে নিয়ে কিছু দিয়েছিলেন, দুচারটি হাসির কথা বলেছিলেন, সে ঘরটি মনে আছে আর তাঁর চেহারাও মনে পড়ে, তবে ঝাপসা ঝাপসা। তাঁর যে চেহারা আমার মনে অঙ্কিত আছে তা সে-সময়কার চাক্ষুষ জ্ঞান থেকে কিম্বা তাঁর যে সকল চিত্র আমরা সচরাচর দেখিতে পাই তার প্রতিচ্ছবি তা ঠিক বলা যায় না—খুব সম্ভব শেষটাই হবে।

কর্তাদাদা যখন আমাদের ছেড়ে বিলাত যাত্রা করেন তখন আমরা নিতান্ত শিশু, সে সব ঘটনা কিছুই মনে নাই। এদেশে যখন তাঁর মৃত্যুর সংবাদ আসে তখন আমরা বোটের মধ্যে গঙ্গার উপরে ভাস ছলুম—ভয়ানক ঝড় তুফান উঠেছে আর বড়দাদা হেমেন্দ্র ও আমি মার কাছে ভয়ে জড়সড়,—সেই তুফানের মধ্যে আমাদের একজন ভৃত্য কর্তাদাদার মৃত্যু সংবাদ এনে বাবামশায়ের হাতে দিলে। এই ঘোর দুর্যোগে আমরা পলতার বাগানে নেমে, সেখান থেকে গাড়ীতে উঠে কোন প্রকারে বাড়ী পৌছলুম—পৌছেই দুধ দুধ করে অস্থির। এইটুকু আমার মনে আছে। পিতার আত্মজীবনীতে ঘটনাটির বর্ণনা এইরূপ :—

"আমাদের স্বরূপ খানসামা আমার হাতে পিতার মৃত্যু সংবাদ আনিয়া দিয়া বলিল, কলিকাতা তোলপাড় হইয়া গিয়াছে। এ সংবাদ হঠাৎ বজ্রপাতের ন্যায় আমার মস্তকে পড়িল। আমাদের বোট ও পিনিস কালনা ছাড়াইয়া কতদূর গিয়াছে, পরদিন প্রাতঃ-কালেই কলিকাতার অভিমুখে ফিরিলাম। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে

অনবরত বৃষ্টি ও বাতাসের কোলাহল। পলতায় আসিতে রাত্রি ৮টা হইল। পলতায় পৌঁছিতেই লোক আসিয়া সংবাদ দিল, এখানে গাড়ী প্রস্তুত। এই কথা শুনিয়া আমার শরীরে প্রাণ আসিল। এখানে আসিয়া বোট কাৎ হইয়া পড়িল। দিন দশটা হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্রমাগত বৃষ্টি পাড়য়াছে। সমস্ত নৌকার খোল জলে পুরিয়া গিয়া তাহার উপরে এক হাত জল দাঁড়াইয়াছে, সকলি বৃষ্টির জল। যদি পলতায় গাড়ী না থাকিত তবে পথে জলভারে বোট নিশ্চয়ই ডুবিত ; একথা আর কাহাকেও বলিতে পারিতাম না। বোট হইতে নামিয়া গাড়ীতে চড়িলাম। রাস্তা জলময়—সেই জলের ভিতর গাড়ির চাকা অর্ধেক মগ্ন। অতিকষ্টে বাড়ী পৌঁছিলাম তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর। সকলেই নিদ্রিত, কাহারও সাড়া শব্দ নাই। বাড়ীর ভিতর স্ত্রীপুত্রদিগকে প্রেরণ করিয়া আমি বৈঠকখানার তেতলায় উঠিলাম। সেখানে আমার জ্যেষ্ঠতাত পুত্র ব্রজবাবু আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন।”

দ্বারকনাথ ঠাকুর দুবার ইউরোপ যাত্রা করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় বারে লণ্ডন নগরে ১৭৭৮ শকে (আগষ্ট ১৮৪৬) তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর বয়ঃক্রম ৫১ বৎসর। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথ ও অপর একজন আত্মীয় নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত ছিলেন। লণ্ডন সহরের প্রান্তবর্তী Kensal Green নামক গোরস্থানে তাঁর সমাধি হয়। আমি প্রথম যখন সেই সমাধি মন্দির দেখি তখন তার নিতান্ত ভগ্নাবস্থা, পরে তার জীর্ণসংস্কার হয়েছে। বঙ্গের শীর্ষস্থানীয় দুই মহাত্মা যাঁরা ঐ সুদূর পশ্চিমে দেহত্যাগ করেছেন, তাঁদের স্মৃতিচিহ্ন যাতে বিলুপ্ত না হয়, সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি রাখা কর্তব্য, একথা বলা বাহুল্য।

দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাত যাবার সময় তাঁর অগাধ জমিদারী বিষয় সম্পত্তি সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা করে যান তা তাঁর মনের মতন হয়নি। যে সকল কর্মচারীর উপর রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল তাঁদের কার্যে

তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। কর্তা নিজে তত্ত্বাবধান না করলে 'যে রক্ষক সেই ভক্ষক হয়' এ এক প্রকার ধরা কথা। আমার পিতা যদি তেমন মনোযোগ করে বিষয় কর্ম দেখতেন তাহলে কোন ভাবনা ছিল না। কিন্তু তাঁর মন ছিল অন্য দিকে, নিতান্ত দায়ে পড়ে যতটুকু করতে হত তাই করতেন। কর্তাদাদা তাঁকে লণ্ডন থেকে এই বিষয়ে এক পত্র লিখেছিলেন তার এই উদ্ধৃতাংশ থেকে দাদামশায়ের মনোভাব কতকটা জানা যায় :—

"আমার সকল বিষয় সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায় নাই ইহাই আমার আশ্চর্য বোধ হয়। তুমি পাদ্রিদের সহিত বাদ প্রতিবাদ করিতে ও সংবাদপত্রে লিখিতেই ব্যস্ত, গুরুতর বিষয় রক্ষা ও পরিদর্শন কার্যে তুমি স্বয়ং যথোচিত মনোনিবেশ না করিয়া তাহা তোমার প্রিয়পাত্র আমলাদের হস্তে ফেলিয়া রাখ। ভারতবর্ষের উত্তাপ ও আবহাওয়া সহ্য করিবার আমার শক্তি নাই, যদি থাকিত আমি অবিলম্বে লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া তাহা নিজে পর্যবেক্ষণ করিতে যাইতাম।"

আমি ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের Sussex জেলার অন্তর্গত সমুদ্রের উপকূল Worthing নামক বন্দরে গিয়া কিছুদিন বাস করি। উহা আমার নিকট এক প্রকার তীর্থস্থানের ন্যায় মনে হয়েছিল, কেননা ঐখানে আমার পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে একমাস কাল যাপন করেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি এক উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হন, এ অবস্থায় তাঁর চিকিৎসক মার্টিনের পরামর্শে রোগ শান্তির জন্যে এই বন্দরে গিয়ে অবস্থিতি করেন। তিনি যে হোটেলে গিয়ে উঠেছিলেন আমি সেই হোটেলের মালিকের সঙ্গে দেখা করি; সাহেবটির নিকট হতে দাদামশায়ের অনেক খবর শুনতে পাই। তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই :—

দ্বারকানাথ ঠাকুরের সর্বশুদ্ধ ১৭ জন অনুচর ছিল, তার মধ্যে দুইজন এদেশীয় ভৃত্য। তা ছাড়া একজন সেক্রেটারি, একজন Interpreter, সঙ্গীত-ওস্তাদ জার্মান একজন, চিকিৎসক

Dr. Martin এবং অপর একজন মিলে এই পঞ্চ সহচর সর্বদা কাছে থেকে তাঁর আবশ্যকমত কাজকর্ম তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিল। আমার ছোটকাকা নগেন্দ্রনাথ আর দূর সম্পর্কীয় পিতৃব্য নবীনবাবু তাঁকে মাঝে মাঝে দেখতে আসতেন। ছোটকাকার গায়ে এক বহুমূল্য সবুজ রংএর শাল ছিল আর জ্বলজ্বলে কাল চোখের প্রশংসা সর্বত্র শোনা যেত। তাঁর কথা আর বেশী কিছু জানতে পারলুম না। আমার পিতামহের শরীর শীঘ্রই ভেঙ্গে পড়ল। রোগের জ্বালায় বড়ই অশান্তি ছটফটানি হয়েছিল। ৬টার সময় উঠে গাড়ী করে বেড়িয়ে ফিরে এসে অল্প নিদ্রা যেতেন—তারপর আহার ; তাঁর ভৃত্য হুলির তয়েরি কারি-ভাত আর একটু কমলানেবুর জেলী, এইমাত্র আহার। পরিচ্ছদের মধ্যে একটি সুন্দর কাশ্মীরি শাল তাঁর গায়ে থাকত। তাঁকে দেখবার জন্যে মহিলারা দলে দলে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকতেন। Duchess of Cleveland প্রত্যহ তাঁকে দেখতে আসতেন—Duchess of Inverness রোজ পত্রদ্বারা তাঁর সংবাদ নিতেন। তিনি তাঁর অমায়িক সৌজন্যে সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করেছিলেন। এত পীড়ার প্রকোপেও তাঁর ধৈর্যচ্যুতি হয়নি। কখনও কোন বিষয়ে ত্রুটি জানিয়ে কারও প্রতি দোষারোপ করতেন না, সর্বদাই সন্তুষ্টচিত্তে, হাসিমুখে থাকতেন। অতি অকর্মা ভৃত্যও তাঁর অনুগ্রহ ও বদান্যতা হতে বঞ্চিত ছিল না। স্বদেশী আচার ব্যবহারের তিনি অনুরক্ত ছিলেন। দেশায় পরিচ্ছদ পরিধান করতেন। আলবোলার নল সর্বদাই তাঁর হাতে থাকত, তাঁর ভৃত্য হুলি তামাক সেজে দিত। তাঁর একটি (Tortoise shell) কাঁচকড়া মসলার ডিবে ছিল। গরম তাঁর আদবে সহ্য হত না, জানালা খুলে শুতেন। প্রত্যহ সকালে স্নান করতেন, আর বরফজল ভাল বাসতেন। দিনরাত তাঁর সেবাশুশ্রূষায় নিযুক্ত প্রিয়ভৃত্য হুলি তাঁর শোবার ঘরের বাহিরে শুয়ে থাকত। অনেক সময় তাঁর বিছানার পাশে মাদুরের উপর বসে তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে

দিত। তাঁর শরীর ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ল, তিনি আপনার আসন্ন মৃত্যু আপনি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন। কেমন আছেন কেহ জিজ্ঞাসা করলে মধুর গম্ভীরস্বরে বলতেন, "I am content" আমি শান্তিতে আছি। ক্রমে তাঁর শরীর আরো অবসন্ন হতে লাগল—তাঁকে স্থানান্তরিত করা আবশ্যক হয়ে পড়ল। অবসর বুঝে সেই স্থান হতে জুলাই মাসের ২৭ তারিখে Dr. Martin তাঁকে সঙ্গে করে লণ্ডনে নিয়ে যান এবং ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ১লা আগষ্ট তিনি পরলোক গমন করেন।

দ্বারকানাথ ঠাকুর ও ম্যাক্সমুলার সম্বন্ধে কথোপকথন

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার সময় প্রোফেসার ম্যাক্সমুলার আমার সংস্কৃতের পরীক্ষক ছিলেন। পরীক্ষান্তে যখন আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, তখন তিনি তাঁর নিজের সম্বন্ধে ও আমার স্বর্গীয় পিতামহ ও পিতৃদেব সম্বন্ধে আমাকে অনেক কথা বলেন।

ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর প্রেমাকর্ষণ সর্বপ্রথমে কিরূপে হয়, সে বিষয়ে তিনি বলেন যে অতি শৈশবকাল হইতে লোকমুখে ভারতবর্ষের নানা প্রকার বিবরণ শুনে তিনি সেটাকে একটা স্বপ্ন-রাজ্যের ন্যায় জ্ঞান করিতেন। রূপকথায় যেমন থাকে যে, যোদ্ধা একদিন হঠাৎ স্বপ্ন দেখিলেন যে, কোন অজানা দেশে এক পরমাসুন্দরী কন্যা বন্দিনীভাবে বাস করছে, তাই দেখে যোদ্ধার মন এমন বিচলিত হল যে, কত খোঁজ করে যুদ্ধ করে যতদিন না তার উদ্ধার সাধন করতে পারতেন, ততদিন যেমন নিশ্চিন্ত থাকতেন না; তেমনি ভারতবর্ষকেও তিনি তাঁর স্বপ্ন-রাজ্যের সুন্দরী বলে কল্পনা করতেন। তারপর যখন তাঁর দশ বৎসর বয়স তখন তাঁর স্কুলের কপিবুকের মলাটে হঠাৎ একদিন কাশীর স্নানের ঘাটের চিত্র দেখে স্বপ্নাবিষ্টের মত সেই দিকে চেয়ে বসে রইলেন। চিত্রটি যদিও বিশেষ পরিস্ফুট ছিল না, তবুও সে ছবিখানি তাঁর বেশ মনে ছিল। তিনি বল্লেন, "ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বাস্তবিক তখন আমার কতটুকু জ্ঞান ছিল? কেবল এই শুনেছিলাম যে ভারতবাসীরা কৃষ্ণকায়, তারা বিধবাদের জ্বলন্ত চিতায় অর্পণ করে, আর স্বর্গলাভ করবার জন্য জগন্নাথদেবের রথচক্রের তলে নিজেদের নিক্ষেপ করে শরীরকে ক্ষতবিক্ষত করে। আমার কপি-বুকের চিত্রে কিন্তু দেখলাম যে তারা বেশ লম্বা এবং সুশ্রী। আর গঙ্গাতীরে যে সকল মন্দিরাদি অঙ্কিত ছিল তাদের সৌষ্ঠব ও উচ্চ চূড়াগুলিতে এমন একটি মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইতেছিল যে, আমার

স্বদেশের গির্জা ও প্রাসাদগুলি তাদের নিকট হীন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। নিজের কল্পনায় মগ্ন হয়ে বসে আছি, এমন সময় হঠাৎ আমার শিক্ষকমশায় এসে কানটি ঝাঁকিয়ে দিয়ে বল্লেন যে, এতক্ষণ কুঁড়েমি করে বসে থাকার দরুণ আমাকে আরও অনেকগুলি পাতা কপি করতে হবে। এই তো গেল ভারতের সঙ্গে আমার প্রথম সকরুণ পরিচয়।

"তারপর বহু বৎসর কেটে গেল। ১৮৪১ সালে আমি যখন লিপ্‌সিগের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করি, তখন আমার কল্পনা বাস্তবে পরিণত হবার লক্ষণ দেখা গেল। একদিন শুনলাম যে সংস্কৃত-চর্চার জন্য নূতন শ্রেণী খোলা হয়েছে এবং প্রোফেসার ব্রকৃহস্ ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে লেকচার দেবেন। আমি রীতিমত সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করে দিলাম এবং নলোপাখ্যান, শকুন্তলা ও ঋগ্বেদের কতক অংশ পড়তে শিখবার পর বার্লিন ও তৎপরে প্যারিসে সংস্কৃত-চর্চা করতে যাই।

"সেই সময় ভারতবর্ষ দেখবার ইচ্ছা আমার বড়ই প্রবল হয়েছিল। ইয়োরোপীয় ছাত্রদের যেমন রোম অথবা এথেন্স দেখবার একটা স্পৃহা থাকে, আমারও তেমনি একবার ভারতবর্ষ দর্শন করে কাশীর পবিত্র গঙ্গায় স্নান করবার জন্য ঐকান্তিক ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু তখন তাহা আমার পক্ষে একরূপ অসম্ভব ছিল, কারণ একে ত তখন ভারত-বর্ষ ছিল ছয় মাসের পথ, তার উপর অধিক ব্যয়সাধ্য। ভারতের মুখ দর্শন করা জীবনে আমার ভাগ্যে ঘটিল না! যৌবনকালে অর্থাভাবে যাওয়া ঘটে নাই, এবং পরে যদিও আমার ভারতীয় বন্ধুদের দ্বারা বার বার নিমন্ত্রিত হয়েছি কিন্তু একে বৃদ্ধকাল তায় নানা কর্তব্য কর্মে জড়িত হয়ে পড়ে এই সব ছাড়িয়ে যাওয়া দুর্ঘটন হল। তা ছাড়া শুধু ভারতবর্ষ একবার বেড়িয়ে এলেই তো আমার মনস্কামনা পূর্ণ হত না। অন্ততঃ দুই তিন বৎসর সেখানে বাস করতে না পারলে, ভাষা-গুলি ভাল করিয়া শিখতে না পারলে এবং দেশীয় পণ্ডিতদের সঙ্গে

নানা বিষয় আলোচনা করতে না পারলে আমার পক্ষে ভারতভ্রমণ বৃথা হত। আমার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক তো শুধু উপর থেকে নয়, তাহা বহু শতাব্দীর ভিতর দিয়ে। কেবল যদি কলিকাতা বা বোম্বাই ঘুরে আসা আমার উদ্দেশ্য হত তাহলে তো বিলাতের অক্সফোর্ড বা বণ্ড ষ্ট্রীট একবার বেড়িয়ে এলেই হয়!

"কিন্তু যদিও আমি কোন দিন ভারতে পদার্পণ করিনি তথাপি আমার সৌভাগ্যবশতঃ য়ুরোপে ভারতের কয়েকজন অসাধারণ প্রতিভা-শালী ও সুযোগ্য সন্তানের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল। অনেকে আমাকে বলেন যে, এই সকল মহৎ-চরিত্র ব্যক্তিগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়ায়, ভারতবাসীর চরিত্র সম্বন্ধে আমার একটা ভুল ধারণা জন্মেছে: কারণ সর্ব বিষয়ের উৎকৃষ্টতা দেখলাম কিন্তু নিকৃষ্টতা কিছু জানতে পারলাম না। আমার মনে হয়—তাতে ক্ষতি কি? ভারত-বাসীর চরিত্রের চরমোৎকর্ষ যে কতদূর হইতে পারে তাহা তো দেখলাম। অবশ্য আমি এমন আশা করি না যে, একটা সমগ্র জাতি কেবল রামমোহন রায় দ্বারকানাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, মালাবারী বা রমাবাইয়ের ছাঁচে ঢালা হবে, কিন্তু তা বলে, যে দেশের মধ্যে থেকে এই সব মহচ্চরিত্র লোক জন্মগ্রহণ করেছেন সে দেশের জাতীয় চরিত্র উপেক্ষা করবার নয়।

"৫০ বৎসর পূর্বে ভারতবাসীরা এমন অবাধে ভ্রমণ করত না। কালাপানি পার হওয়ার বিভীষিকা তখন খুব প্রবল ছিল; সুতরাং ১৮৪৪ সালে যখন একদিনে সহরময় রাষ্ট্র হইল যে ভারতের একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু প্যারিসে এসেছেন এবং সর্বোৎকৃষ্ট হোটেলের সর্বোৎকৃষ্ট গৃহে বাস করছেন, তখন প্যারিসে হুলস্থুল পড়ে গেল এবং আমারও তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার জন্য মন চঞ্চল হয়ে উঠল। আমি তখন কলেজ-ডি-ফ্রান্সে প্রোফেসার বারনুফের কাছে সংস্কৃত শিক্ষা করতাম, এবং যখন দেখলাম যে নবাগত ভদ্রলোকটি আমারই এই প্রোফে-সারের কাছে পরিচয়-পত্র নিয়ে এনেছেন, তখন তাঁর সঙ্গে আলাপ

হতে বড় বেশী বিলম্ব হল না। প্রোফেসার বারন্নুফ একদিন আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং তারপর থেকে তাঁর সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা হল। তিনি হচ্ছেন তোমার পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর।

"দ্বারকানাথ সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত না হলেও সংস্কৃত সাহিত্য-জ্ঞান তাঁর বেশ ছিল। প্রথম যখন তাঁকে আমি দেখি তিনি ইনষ্টিট্যুট্-ডি-ফ্রান্সে প্রোফেসার বারন্নুফের সঙ্গে কথা কইছিলেন। প্রোফেসার তাঁকে নিজের ভাগবতপুরাণের উৎকৃষ্ট ফরাসী তর্জমার বইখানি উপহার দিলেন। এক দিকে সংস্কৃত শ্লোকগুলি, অপর দিকে ফরাসী তর্জমাগুলি ছাপান ছিল। দ্বারকানাথ তাঁর সুগঠিত শ্যামল অঙ্গুলী ফরাসী তর্জমার পাতার উপর রেখে নিশ্বাস ফেলে বল্লেন, 'আহা এই-গুলি যদি আমি পড়্‌তে পারতাম; তাঁর স্বদেশের প্রাচীন ভাষা জানবার জন্য তাঁর তেমন আগ্রহ ছিল না, যত ফরাসী ভাষার জন্য ছিল।

"যখন তিনি শুনলেন যে আমি সংস্কৃত ভাষা শিখবার জন্য কিরূপ আগ্রহান্বিত, তখন আমার প্রতি তাঁর একটা আকর্ষণ হল। তিনি প্রায়ই আমাকে নিমন্ত্রণ করতেন এবং আমিও গিয়ে সারা সকালটা তাঁর কাছে প্রায়ই কাটিয়ে আসতাম। ভারতের নীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার অনেক কথা হত। তিনি অত্যন্ত সঙ্গীত প্রিয় ছিলেন এবং ইটালীয় ও ফরাসী সঙ্গীত খুব পছন্দ করতেন। তিনি গান করতেন আর আমি সেই গানের সঙ্গে পিয়ানো বাজাতাম—এই ভাবে আমাদের দিনগুলি বেশ আনন্দে কেটে যেত। তিনি বেশ সুকণ্ঠ ছিলেন। একদিন আমি তাঁকে বল্লাম একটি খাঁটি ভারত-সঙ্গীত গাইতে, তাতে তিনি যে গানটি প্রথমে গাইলেন, সেটা ঠিক ভারতীয় নয়, পারসিক গজল, এবং আমিও তাতে বিশেষ কোন মাধুর্য পেলাম না। খাঁটি ভারত-সঙ্গীত গাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায় তিনি মৃদু হেসে বল্লেন, 'তুমি তা উপভোগ করতে পারবে না।' তারপর আমার অনুরোধ রক্ষার জন্য একটি গান নিজে বাজিয়ে

গাইলেন। সত্য বলিতে কি, আমি বাস্তবিকই কিছু উপভোগ করতে পারলাম না। আমার মনে হল যে, গানে না আছে সুর, না আছে ঝঙ্কার, না আছে সামঞ্জস্য। দ্বারকানাথকে এই কথা বলায় তিনি বল্লেন, 'তোমরা সকলেই এক রকমের। যদি কোন জিনিস তোমাদের কাছে নতুন ঠেকে বা প্রথমেই তোমাদের মনোরঞ্জন করতে না পারে, তোমরা অমনি তার প্রতি বিমুখ। প্রথম যখন আমি ইটালীয় গীতবাদ্য শুনি, তখন আমিও তাতে কোন রস পাইনি, কিন্তু তবু আমি ক্ষান্ত হইনি; আমি ক্রমাগত চর্চা করতে লাগলাম যতক্ষণে না আমি তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারলাম। সকল বিষয়েই এইরূপ। তোমরা বল আমাদের ধর্ম ধর্মই নয়, আমাদের কাব্য কাব্যই নয়, আমাদের দর্শন দর্শনই নয়। ইয়োরোপ যাহা প্রকাশ করে আমরা চেষ্টা করি তাহা বুঝতে ও হৃদয়ঙ্গম করতে, কিন্তু তাই বলে ভারতবর্ষ যাহা প্রকাশ করে তাকে অবহেলা করি না। আমরা যেমন তোমাদের সঙ্গীতবিদ্যা, কাব্য, দর্শন আলোচনা করি, তোমরা যদি তাই করতে তাহলে তোমরাও আমাদের দেশের বিদ্যাগুলির মর্ম বুঝতে পারতে এবং আমাদের যে অজ্ঞ ও ভণ্ড মনে কর, বাস্তবিক আমরা তা নই, বরং অজ্ঞাত বিষয়ে তোমরা যা জান, আমরা হয়তো তারো অধিক জান্‌তে পেরেছি দেখতে।' বাস্তবিক তিনি নিতান্ত ভুল বলেন নি।

"এই কথাগুলি বলতে বলতে তিনি ভারি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন; তাঁকে ঠাণ্ডা করবার জন্য আমি অন্য বিষয়ের অবতারণা করে বল্লাম যে, 'আমি শুনেছি যে ভারতীয় সঙ্গীতের উৎপত্তি অঙ্কশাস্ত্র হইতে। আমি একবার সঙ্গীত শাস্ত্রের একটা সংস্কৃত খস্‌ড়া দেখেছিলাম কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না। প্রোফেসার উইল্‌সন্‌ একজন সঙ্গীতজ্ঞ লোক এবং তিনি বহুবৎসর ভারতবর্ষে বাস করেছিলেন, সেইজন্য তাঁকে আমি ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এবং ভারতীয় সঙ্গীত-বিদ্যা শিখতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম কিন্তু তিনি আমাকে বিশেষ উৎসাহ দিলেন

না। তিনি বল্লেন যে, তিনি গান শিখবার জন্য একবার একজন কালোয়াতের কাছে গিয়েছিলেন, তাতে কালোয়াত বলেন যে, তিনি ছয় মাস পর্যন্ত সপ্তাহে দুই তিন দিন করে তাঁর কাছে এসে গান শিখলে পর তিনি বলতে পারবেন যে এই ছাত্র সঙ্গীত-বিদ্যা শিখবার উপযুক্ত কি না এবং তারপর একাদিক্রমে পাঁচ বৎসর কাল রীতিমত শিক্ষা করলে তবে পারদর্শী হতে পারবেন। এই কথা শুনে প্রোফেসার উইল্‌সন্‌ সেইখানেই ক্ষান্ত দিলেন। সঙ্গীত-রত্নাকর প্রভৃতি বিখ্যাত সঙ্গীত পুস্তকগুলি লাইব্রেরীতে দেখে আমার বড়ই লোভ হত শিখবার জন্য, কিন্তু প্রোফেসার উইলসনের মুখে ঐ কথা শুনে পর্যন্ত আমাকেও ইচ্ছা দমন করতে হল। তোমাদের ঠাকুরপরিবারের মধ্যে আর একজন সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রধান পৃষ্ঠপোষক আছেন—তিনি হচ্ছেন রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

"তোমার পিতামহ দ্বারকানাথ খুব বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। কেন জানি না, তিনি ব্রাহ্মণকুলকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন না এবং একদিন যখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, দেশে ফিরে গিয়ে তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে কি না, তিনি হেসে বল্লেন, 'আমি তো চিরকাল বহুতর ব্রাহ্মণকে পোষণ করে আসছি, সেই আমার পক্ষে যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত!' কিন্তু তিনি যে কেবল দেশীয় ব্রাহ্মণদেরই হীন চক্ষে দেখতেন তা নয়—তিনি যাদের নামকরণ করেছিলেন 'কালো কোট পরা বিলাতী ব্রাহ্মণ',—তাদেরও সমান নীচ চক্ষে দেখতেন। যদিও তিনি ইংরাজদের সকল বিষয়েই প্রশংসা করিতেন, কিন্তু পাদ্রিকুলের কোন নিন্দাবাদ বা লজ্জাজনক ব্যবহারের কথা জানাতে পারলে তিনি ভারি আমোদ বোধ করতেন। তিনি অনেকগুলি রাজনৈতিক ও পারমার্থিক সংবাদপত্র পড়তেন। তাঁর একখানি খাতা ছিল যার মধ্যে তিনি অতি যত্ন সহকারে পাদ্রিদের নিন্দাজনক নানা কথা লিখে রাখতেন। সে এক অদ্ভুত সংগ্রহ—অনেক সময় আমি ভাবি যে সে খাতাখানির কি দশা হল। তোমার

ঋষিপ্রতিম পিতা কখনই সে খাতা লয়ে রহস্য করেন নি নিশ্চয়ই। কিন্তু যখনই খৃষ্টধর্ম ও হিন্দুধর্মের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠতা নিয়ে কারো সঙ্গে তর্ক বাধতো, দ্বারকানাথ তখনই সেই খাতাখানি প্রমাণস্বরূপ বের করতেন। অবশ্য আমি বলতাম যে, কোন দেশেরই ধর্মযাজকদের ব্যক্তিগত চরিত্রের উপর নির্ভর করে ধর্মের বিচার করা চলে না।

দ্বারকানাথ প্যারিসে খুব জাঁকজমক সহকারে বাস করতেন। তখনকার রাজা লুই ফিলিপ কর্তৃক তিনি সমাদরে গৃহীত হয়েছিলেন। শুধু তা নয়—দ্বারকানাথ একদিন খুব সমারোহে সান্ধ্য-সম্মিলনের আয়োজন করেন, তাতে রাজা লুই ফিলিপ ও বহু উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসেন। দ্বারকানাথ সমস্ত ঘরখানি মূল্যবান কাশ্মারি শাল দ্বারা সজ্জিত করেছিলেন! তখন কাশ্মীরের শাল ছিল ফরাসী স্ত্রীলোকদের একটা আকাঙ্ক্ষার বস্তু, সুতরাং কল্পনা কর যে তাদের কি অনির্বচনীয় আনন্দ হল, যখন এই ভারতের রাজপুত্রটি বিদায়কালীন প্রত্যেক স্ত্রীলোকের অঙ্গে একখানি শাল জড়িয়ে দিলেন।

"ইংলণ্ডে বাসকালীন দ্বারকানাথ একটি মহা পুণ্যকর্ম করেন। ভারতের প্রধান ধর্মসংস্কারক রাজা রামমোহন রায়ের ভস্ম ব্রিষ্টলের গোরস্থানে সমাধিস্থ করা হয়েছিল; দ্বারকানাথ সেই স্থানের উপর সুন্দর মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন। হায়! তখন তিনি কল্পনাও করেন নি যে, অল্পকালের মধ্যে তাঁকেও এইরূপ বিদেশে প্রাণত্যাগ করতে হবে।

বেদ

"আমার বড়ই আশ্চর্যবোধ হয় যে, যে দেশে বেদের এত মাহাত্ম্য এবং যা প্রধান ধর্মপুস্তক বলে গণ্য, সে দেশে কি না আজ পর্যন্ত বেদ ছাপানো হয়নি এবং সকলের তাতে অধিকারও নেই,

কেবল অল্পসংখ্যক পণ্ডিতের নিকট বেদের কতকগুলি খস্ড়া আছে মাত্র এবং তাই থেকে কেহ কেহ কণ্ঠস্থ করেছেন। সুতরাং পরলোকগত জে, মিয়োর যখন বেদের একটা সংস্করণ প্রকাশ করবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন, তখন কোন ভারতবর্ষীয় পণ্ডিত এই কার্যে হস্তক্ষেপ করতে সাহস করলেন না।

"আমি যখন বেদের সংস্করণ প্রকাশ করবার জন্য প্যারিস, বার্লিন ও লণ্ডনের পুস্তকালয়ে বেদের যত খসড়া আছে, নীরবে সব সংগ্রহ করে, তা থেকে নকল করে ধারাবাহিকরূপে গোছ করিতেছিলাম, তখন দ্বারকানাথ খুব আগ্রহ সহকারে আমার কার্যাবলী দর্শন করতেন। ঠিক সেই সময়েই তোমার পিতা দেবেন্দ্রনাথ চারজন ব্রাহ্মণকুমারকে চতুর্বেদ শিক্ষা করবার জন্য কাশীতে পণ্ডিতদের কাছে পাঠান। আমি প্রথমে মনে করেছিলাম যে, বুঝি দ্বারকানাথ আমার বেদ প্রকাশ সম্বন্ধে পুত্রকে কিছু লিখে থাকবেন, এবং তাই থেকে কাশীতে ছাত্র পাঠাবার কল্পনা তাঁর মাথায় আছে, কিন্তু পরে তাঁর কাছ থেকে যে চিঠি পাই, তাতে জানালাম যে আমার ভ্রম হয়েছিল ; দেবেন্দ্রনাথের বহুদিন থেকেই এরূপ মানস ছিল। বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে, কোন ছাত্রই পরে কোন বিশেষত্ব দেখাতে পারে নাই।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

"আমি কখনও তোমার পিতাকে দেখিনি, কিন্তু তাঁর নিকট থেকে আমি অনেকগুলি সুন্দর চিঠি পেয়েছি। তাঁর দেশের ধর্মোন্নতির জন্য তিনি যে সকল মহৎ অনুষ্ঠান করেছেন তাতে আমার আন্তরিক সহানুভূতি আছে। যদিও কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে তাঁর ধর্মবিচ্ছেদ ঘটেছিল, তবু তিনি তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন।"

বিদায়কালীন পূর্বকথা স্মরণ করে তিনি বল্লেন, "Oh! I

have smoked many a Hookah with your grandfather in Paris!"

কর্তাদাদামশায়ের স্মৃতি যতই অস্পষ্ট হোক্ না কেন, মেজকাকা ও ছোটকাকাকে (গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ) আমার বেশ মনে পড়ে। তাঁদের মুখশ্রী জীবন্তভাবে দেখছি, তাঁদের কথাবার্তা শুনছি, এখনো মনে করতে পারি। বাবামশায় অনেক সময় বাড়ী থাকতেন না। তাঁর আত্মজীবনীতে দেখতে পাই, তিনি প্রতি বৎসর পূজার সময় কোন না কোনখানে ভ্রমণে বেরোতেন। যখন গঙ্গায় বেড়াতে যেতেন তখন কোন কোন বার আমাদের সঙ্গে নিতেন, নইলে বাড়ীতে রেখে যেতেন। মাঁর কাছে আমরা বেশিক্ষণ থাকতুম না—আমাদের আসল আড্ডা ছিল মেজকাকিমার ঘর; সেই আমাদের শিক্ষালয়, সেই বিশ্রাম-স্থান। বলতে গেলে মেজকাকিমাই আমাদের মাতৃস্থানীয়া ছিলেন; তাঁর কাছে আমরা গল্প শুনতুম, তাঁর সঙ্গে তাস খেলতুম, তাঁর কাছ থেকে বেছে নিয়ে বই পড়তুম—হাতেমতাই, লয়লামজনু, নবনারী, আরব্য উপন্যাস, ল্যাম্বস্ টেল, পল ভার্জিনিয়ার অনুবাদ, এই রকম কতকগুলি বই আমাদের পুঁজি ছিল। আমাদের অন্তঃপুরে মহিলাদের মধ্যে সেকালে উচ্চশিক্ষার প্রচার ছিল না, তবুও কাকিমা প্রভৃতি বাড়ীর মেয়েরা কেহ কেহ বাঙ্গালা বেশ জানতেন, তাঁরাই আমাদের একপ্রকার শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। কিন্তু অন্যসময় যাই হোক্ ব্যামোর সময় আমরা মার কাছেই থাকতুম। তখন আমাদের মাঝে মাঝে বাঁধা নিয়মে তিনদিনব্যাপী একরকম জ্বর হত তা ম্যালেরিয়া বলতে পারি না, কেননা তখন ম্যালেরিয়া ছিল না। জ্বর হলেই ডাক্তার দ্বারি গুপ্ত আমাদের দেখতে আসতেন, কে জানে তাঁকে দেখলেই প্রাণ উড়ে যেত। তাঁর ব্যবস্থা ছিল—প্রথম দিন তেল (Castor Oil) ও তেলের চেয়েও বিস্বাদ জলের সাগু, দ্বিতীয় দিন এলাচদানার মত সামান্য কিছু পথ্য; তৃতীয় দিন ফুলকো রুটি; চতুর্থ দিন ভাত—সেই জ্বরের এই ক্রম

ছিল। তখনকার কালে ব্যামোর সময় হাওয়া বদলের জন্যে বরাহনগর প্রভৃতি কাছাকাছি গঙ্গার ধারের জায়গা ও হুগলী বর্ধমান প্রভৃতি দূরের কোন কোন স্থান স্বাস্থ্যকর বলে গণ্য হত। এইক্ষণে সেই সকল স্থান ম্যালেরিয়ার আবাসভূমি বলে পরিত্যজ্য। তেমনি আবার কলকাতা এখন জলের কলে, নালানর্দমার সংস্কারে ও আর আর ম্যুনিসিপাল বন্দোবস্তে পূর্বাপেক্ষা অনেক স্বাস্থ্যকর হয়েছে সন্দেহ নাই; এমন কি, কলকাতাই এক্ষণে পল্লীবাসীদের বায়ু-পরিবর্তনের ও স্বাস্থ্য-অর্জনের প্রধান স্থান বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। মৃত্যুর তালিকা পরীক্ষায় কলিকাতা ইউরোপেরও প্রধান প্রধান নগরীর সমকক্ষ দেখা যায়। অনেক ইংরাজে বলেন দুই একমাস ছাড়িয়া দিলে স্বাস্থ্যের হিসাবে কলিকাতার সমতুল্য স্থান ভারতবর্ষে মেলা দুষ্কর।

নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর (ছোটকাকা)

ছোটকাকার কাছে আমরা অনেক সময় যেতুম। তিনি গৌরবর্ণ তেজীয়ান্ সুশ্রী পুরুষ ছিলেন কিন্তু কড়া মেজাজের লোক বলে মনে হত, আমরা তাঁকে ভয় করে চলতুম। তাঁর বৈঠকখানায় নানা রকম লোভনীয় জিনিস ছড়ান থাকত। একবার মনে আছে ছোট ছোট ছর্‌রা-ভরা মকমলের কাপড় মোড়া একরকম সর্পাকৃতি কাগজ চাপা তাঁর লেখবার টেবিলে ছিল, তার উপর আমার দৃষ্টি পড়ল। কাপড় ঢাকার ছিদ্র দিয়ে গুলিগুলো ঝরে পড়ছে, তাই এক মুঠা কুড়িয়ে নিয়েছিলুম। একটু পরে আমায় তলব পড়ল, চোরামাল শুদ্ধ ধরা পড়ি আর কি ! তখন কি করি সীসার গুচ্ছ মুখে পুরে রেখে ছোটকাকার কাছে হাজির। তার কিয়দংশ গলাধঃকরণ হয়েছিল কি না মনে নাই, আর গেলবার দরুণ পরে কোন অসুখ ভোগ করতে হয়েছিল কিনা বলতে পারি না।

ছোটকাকা দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে বিলাত যাত্রা করেছিলেন। তিনি সেখান থেকে তাঁর আত্মীয় বন্ধুদের যে সকল চিঠিপত্র লিখতেন তা দেখে বোধ হয় তিনি সে দেশে বেশ আমোদে ছিলেন, আর তাঁর প্রবাসকালে ইংলণ্ড, স্কটলণ্ডের নানা স্থানে ভ্রমণ করে ব্যাড়াতেন। তাঁর রূপ লাবণ্যের দরুণ তিনি সাহেব বিবিদের, বিশেষতঃ বিবিদের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন, প্রবাস থেকে স্বদেশে সহজে ফিরতে চাইতেন না। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তাঁর পিসতুত ভাই চন্দ্রবাবু তাঁকে দেশে ফেরবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করে পত্র লেখেন, তাতে তাঁকে এইরূপে লোভ দেখাচ্ছেন—

"আগামী মাসে অক্সফোর্ড কেম্বি্‌জের আদর্শে উচ্চ শিক্ষা বিধান উদ্দেশে কলিকাতায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবে, তাহাতে তুমি প্রবেশ করিয়া তোমার ইচ্ছামত বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারিবে।

তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় এখানেও বিদ্যার্থীগণ কৃতিত্ব দেখাইতে পারিলে উপাধি ও সম্মানের বিবিধ চিহ্ন সকল লাভ করিতে পারিবে। অতএব বাড়ী ফিরিলে তোমার শিক্ষা অসমাপ্ত থাকিবার যে আপত্তি তার গুরুত্ব অনুভব করিবে না।". (21st September 1846)

ছোটকাকা সেই সময় তাঁর এক বন্ধুকে যে পত্র লেখেন তাহাতে বাড়ী ফিরতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে এইরূপ লিখেছেন—

"তোমার নিকট মনের কথা খুলিয়া বলিতে কি, আমার এখন দেশে ফিরিবার ইচ্ছা নাই, কি কারণে ঠিক বলিতে পারি না। তুমি জান, আমি সাধারণতঃ ইংরাজ জাতিকে ভালবাসি না, তাদের চাল-চলন দুচক্ষে দেখিতে পারি না, তাদের সকল বিষয়ে বণিকবৃত্তি আমি মনের সহিত ঘৃণা করি, তথাপি একটা কি আছে যাহা এই সকল বিরুদ্ধভাবকে খণ্ডন করিয়া দিতেছে; ইংলণ্ড ছাড়িয়া কলিকাতার যাইতে কোন মতেই আমার মন উঠিতেছে না।"

অবশেষে বাধ্য হয়ে তাঁকে বাড়ী ফিরতে হল; যেদিন ফিরে এলেন আমার বেশ মনে পড়ে, ছেলেদের সে মহোৎসবের দিন, কেননা তিনি আসবার সময় তাদের জন্যে নানা রকম খ্যালনা নিয়ে এসেছিলেন। সেগুলি আমাদের মধ্যে বিতরণ করা হল, আমি একটা কলের ময়ূর পেয়েছিলুম।

ছোটকাকার কাছে অনেকানেক লোক যাওয়া আসা করত—রমাপ্রসাদ রায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র—পুরাকালের সব খ্যাতনামা পুরুষ—এ সবার মধ্যে তাঁর দুজন মুসলমান বন্ধু ছিল, বজলুল করীম ও বজলুল রহীম। তাঁদের নিয়ে অনেক আমোদ প্রমোদ হত, কখনও বা ইংরাজী মোগলাই মিশ্রিত খানা দেওয়া হত। হিন্দু মুসলমানে যেমন হৃদ্যতা ও মেলামেশা ছিল এখন তা দুর্লভ-দর্শন।

বিলাত থেকে ফিরে আসবার পরে ছোটকাকা দেখলেন আমাদের কার-ঠাকুর কোম্পানী হাউস তখনো বেশ চল্‌ছে। ভিতরে

ভিতরে তার যে অসার টলমল অবস্থা তা বুঝতে না পেরে তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। শেষে সেই হাউস ফেল হওয়াতে তিনি অশেষ ঋণভারে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। তিনি ও তাঁর মধ্যম ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথ উভয়েই স্বভাবত ব্যয়শীল ছিলেন। এই বিষয় পিতার জীবনীতে এইরূপ বর্ণিত আছে—

"এত দিনে, এই দশ বৎসরে আমাদের ঋণ অনেক পরিশোধ হইয়া গিয়াছে। পিতৃঋণের মহাভার আমার অনেক কমিয়াছে। কিন্তু আমার আর এক প্রকার নূতন বিপদভার, ঋণভার আমাকে জড়াইতে লাগিল। গিরীন্দ্রনাথ যখন জীবিত ছিলেন তখন তিনি তাঁহার নিজের খরচের জন্য অনেক ঋণ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার কতক ঋণ পিতৃঋণের সঙ্গে পরিশোধ করিয়াছিলাম। এখন আবার নগেন্দ্রনাথ তাঁহার নিজ ব্যয়ের জন্য অধিকাধিক ঋণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কেবল নিজের ব্যয়ের জন্য নয়, এমন কি, ১০০০০ দশ হাজার টাকা ঋণ করিয়া তিনি আর একজনের আনুকূল্য করিতেন—তিনি এমনি পরদুঃখে দুঃখী ও দয়ালু ছিলেন। তাঁহার বদান্যতা, তাঁহার প্রিয় ব্যবহার লোকের মনকে অতিমাত্র আকর্ষণ করিয়াছিল।" (ত্রিংশ পরিচ্ছেদ)

তিনি উল্লিখিত নানা কারণে বিলাত থেকে ফিরে এসে অবধি একটা উচ্চ পদের সরকারী চাকরীর সন্ধানে ফিরছিলেন। যে সকল বড় বড় সাহেব তাঁর পিতার বন্ধু ছিলেন তাঁদের সাহায্য প্রার্থনা করে পত্র লেখেন; অনেক সাধ্য সাধনার পর তিনি ৬ই মার্চ ১৮৫৪ সালে কষ্টম্‌স কলেক্টরের সহকারীরূপে নিযুক্ত হন। কিন্তু সে পদ তাঁকে অধিক দিন ভোগ করতে হয় নাই। ১৮৫৬ সালে জুন মাসে তিনি ইস্তফা পত্র দিয়ে তাঁর কলেক্টর Young সাহেবকে লিখছেন—

"আজ আমার অবকাশের দিন সমাপ্ত হইল। দুঃখের সহিত নিবেদন করিতেছি, গত তিন মাস ধরিয়া আমার বিষয় কর্মের ঝঞ্ঝাট মিটাইবার সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া তাহাতে যদিও অনেকটা কৃতকার্য

হইয়াছি কিন্তু সম্পূর্ণরূপে হইতে পারি নাই। আরো তিন সপ্তাহ-কাল সময় না পাইলে এই সমস্ত গোলযোগ নিষ্পত্তি করিয়া আমার কর্মে ফিরিয়া যাওয়া আমার পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব। আপনি আমার পুনঃ পুনঃ ছুটির আবেদন গ্রাহ্য করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্টও যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছেন; পুনরায় ছুটির দরখাস্তে (একদিনের জন্যও) আপনাদিগকে বিরক্ত করা আমি নিতান্ত অন্যায় বিবেচনা করি, অতএব একান্ত বাধ্য হইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট আমার এই চাকরীর ইস্তফা পত্র প্রেরণ করিতেছি। যখন প্রথমে আমি গবর্ণমেণ্টের এই চাকরী স্বীকার করি, তখন তাহার বেতনের প্রতি আমার দৃষ্টি ছিল না কিন্তু এইক্ষণে আমার যেরূপ বৈষয়িক অবস্থা এখন তাহাতে আমার ঔদাসীন্য করা ঠিক হয় না। আমার এই যে দুরবস্থা ঘটিয়াছে তাহা আমার নিজের দোষে নয় কিন্তু আমার স্বর্গগত ভ্রাতার ঋণভার আমার উপরে পড়িবার দরুণ আমি একান্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে প্রার্থনা এই যে গবর্ণমেণ্ট আমার প্রকৃত অবস্থা অবগত হইয়া যাহাতে ভবিষ্যতে আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয় সেই বিষয়ে কৃপাদৃষ্টি করেন।"

Young সাহেব এই পত্রের উত্তরে লেখেন—"তুমি লিখিতেছ যে তিন সপ্তাহ সময় পাইলে তুমি তোমার পাওনাদারদের সঙ্গে বোঝাপড়া করিয়া এই দায় হইতে মুক্ত হইতে পার। তা যদি হয় তাহা হইলে আমার পরামর্শ এই যে একেবারে ইস্তফা না দিয়া তুমি আর এক মাসের অবকাশ প্রার্থনা করিয়া গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত কর, উত্তর পাইলে যথাকর্তব্য স্থির করিবে। আপাতত আমি তোমার এই ইস্তফা-পত্র গবর্ণমেণ্টে না পাঠাইয়া আগামীকল্য পর্যন্ত তোমাকে মনঃস্থির করিবার সময় দিতেছি।"

কলেক্টর সাহেবের পরামর্শ অনুসারে ছোটকাকা কার্য করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। ইহার কয়েক মাস পরেই

দেখা যায় তাঁর শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে ও স্বাস্থ্যলাভ মানসে তিনি বোম্বাই নাসিক ইন্দোর উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ভ্রমণে বাহির হন।

কলিকাতা হতে বিদায় নিয়ে তিনি বিদেশ থেকে বন্ধুবান্ধবদের যে সকল পত্র লিখেছিলেন তা হতে তাঁর এই ভ্রমণবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমস্তটাই পাওয়া যায়—তাহা সংক্ষেপে এই :—

বোম্বাই, ১৩ই ডিসেম্বর ১৮৫৬

তিনি সমুদ্র-পথ দিয়া বোম্বাই যাত্রা করেন। বোম্বাই পৌছিয়া Elephanta ও সালসেটের গুহামন্দির ও অন্যান্য হিন্দুকীর্তি দর্শন করিয়া তলঘাট পর্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়া পিম্পলগামে উপনীত হন।

পিম্পলগাম, ১৩ই ডিসেম্বর ১৮৫৬

"মারওয়াড় প্রদেশের মধ্য দিয়া চলিতেছি—এই দেশ রাজপুত-বীর ও বীরঙ্গনাগণের রঙ্গভূমি। কিন্তু হায়! সে সব কীর্তি কোথায়? যাইতে যাইতে মনে হইতেছে, "Tis Greece but living Greece no more" গ্রীস বটে কিন্তু সে জীবন্ত ভাব তাহাতে নাই।

পরে তথা হইতে নাসিক উত্তীর্ণ হইলাম, যাহা শিবাজীর অযোগ্য প্রতিনিধি বাজীরাওয়ের বাসস্থান। সঙ্গে কোন ভৃত্য নাই, বন্ধু নাই, মনে অশান্তি, শরীর অপটু এই অবস্থায় ডাঙ্গা পথ দিয়া সহস্র ক্রোশ নিরাপদে অতিক্রম করিতে পারিব এরূপ আশা করি নাই।"

মালেগাম, ২১এ ডিসেম্বর

"চান্দোর দেখিলাম। অত্যুচ্চ পর্বত পরিবৃত মনোজ্ঞ দুর্গম স্থান। যে সকল প্রদেশ মরাঠী ও পিণ্ডারী যুদ্ধে ব্রিটিশ সৈন্যের গোলাগুলি বর্ষণে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ইহা অন্যতর, ইহার গাত্রে সেই ক্ষতচিহ্ন সকল অদ্যাপি বর্তমান। রাজবাটী (রঙ্গমহল) দর্শন করিলাম। ইহার ভিতর প্রথম হোলকারের গদী রক্ষিত আছে, একটি সামান্য কাঠের গদী, সেই অশ্বারোহী

বীরসেনার যোগ্য আসন বটে। চান্দোর ত্যাগ করিয়া দিনের আলো থাকিতে থাকিতে তলঘাটের শোভা সন্দর্শন করিলাম। চারিদিকে পাহাড়শ্রেণী—কি চমৎকার দৃশ্য! এই পর্বতমালার উপর দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে তাহার নির্মাণকৌশল কি আর বর্ণনা করিব—যে কারিগরের ইহা মনঃকল্পনা তাহার প্রতিভা স্মরণ করিয়া দিতেছে এবং স্পষ্টাক্ষরে প্রকৃতির উপরে বিজ্ঞানের জয় ঘোষণা করিতেছে। ঘাট হইতে নামিয়া উপত্যকা ভূমির দৃশ্যও অতি মনোহর—শ্যামল শস্যক্ষেত্রে যেন মখমল বিছাইয়া দিয়াছে। চতুষ্পার্শ্বস্থ কুঞ্জবন আবার বিহঙ্গদলের মধুর গানে প্রতিধ্বনিত—এ সকলি যারপর নাই মনোমুগ্ধকর। কিন্তু ভাই সে যাহাই হৌক, বাড়ীর দিকে আমার মন পড়িয়া রহিয়াছে—মনে হইতেছে আমার সেই কোণের ঘরটি পৃথিবীর সকল স্থানের মধ্যে সেরা।"

ইন্দোর, ২৮এ ডিসেম্বর

ইন্দোর হইতে আমার পিতাকে যে পত্র লেখেন তাহাতে তলঘাটের শোভা সৌন্দর্য পুনর্বার উত্থাপন করিয়া লিখিতেছেন, "আমি Alps পর্বতে ভ্রমণ করিয়াছি, তাহার উপর দিয়া যে পথ কাটিয়া গিয়াছে তাহা প্রশংসাযোগ্য, তবুও এই গিরিপথের নিকট তাহাকে হার মানিতে হয়। এই সকল পথ দিয়া ভ্রমণ করা অতিশয় শ্রান্তিজনক। আমি বাল্যকাল হইতে ভ্রমণে অভ্যস্ত না হইলে এতটা কষ্ট সহ্য করিতে পারিতাম না।"

তাঁর আর এক বন্ধুকে লিখিতেছেন—"আমি ইন্দোর সহর দেখিলাম। বিশেষ কিছু দ্রষ্টব্য নাই। রাস্তা ঘাট পাথরে বাঁধান, ভাল স্প্রিঙের গাড়ীর পক্ষে একেবারে অচল। ঘিঞ্জী সহর, বাজার যেমন আমাদের বড় বাজার, সরু সরু গলী, ময়লা ধুলিময়, ঠিক আমাদেরই পুণ্য নগরীর অনুরূপ। রাজপ্রাসাদে গিয়া সমস্ত দেখিলাম; ছোট ছোট ঘর, সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি, ঠিক যেন একটি কয়েদখানা। দেখিবার মধ্যে সুবিখ্যাত অহল্যাবাইয়ের সমাধি

মন্দির, প্রস্তর নির্মিত, নানা মূর্তি খোদিত, ইহার কারুকার্য বাস্তবিক সুন্দর ও প্রশংসনীয়। আমার ভ্রমণকালে আমার দেশীয় লোকেরা আমাকে যে আদর যত্ন করিয়াছে তাহা কখনও ভুলিব না।"
(To Jadub Kissen Singh)

আগ্রা ৫ই জানুয়ারী ১৮৫৭

"ইন্দোর হইতে যখন তোমাকে পত্র লিখি তখন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে আগ্রায় আসিয়া আমি এরূপ রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িব। আসল কথা হচ্ছে, এ সকল স্থানে ব্যাড়াইবার আরাম নাই, রাস্তা ঘাট দুর্গম, গাড়ীর ঝাকানি, আবহাওয়াও পীড়াদায়ক। এই শরীর লইয়া কোন রকমে যে আগ্রায় পৌঁছিয়াছি, হাত পা ভাঙ্গিয়া যায় নাই, এই আশ্চর্য! সাত দিন সর্দি কাশীতে শয্যাগত ছিলাম—গলার আওয়াজ বন্ধ, অস্ত্র করিতে হইল। একটু ভাল হইয়াছি, কল্যই কলিকাতার অভিমুখে রওয়ানা হইব। আগ্রায় আসিয়া তাজ দেখিয়াছি—আমার যে এতটা পথের কষ্ট—এত অর্থব্যয় এই তাজ দর্শনে তাহা সার্থক বোধ হইতেছে।"

১৮৫৪ সালে ছোটকাকার বিবাহ হয়। যখন তিনি 'তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা' যশোহরের একটি বালিকার পাণিগ্রহণ করেন তখন আমার বয়ঃক্রম ১২ বৎসর—ঘটনাটি আমার বেশ মনে পড়ে। বিবাহের পর তাহার বৈলাতিক বন্ধুরা তাঁহাকে পত্র দ্বারা অভিনন্দন করেন। Duke of Inverness লিখিতেছেন—"আমি ইংলণ্ডে তোমাকে অতি বালক দেখিয়াছিলাম—ইহার মধ্যে তোমাকে বিবাহিত বলিয়া কিছুতেই মনে করিতে পারি না। তুমি যে আমাদের দৃষ্টান্তে এক পত্নী লইয়াই সংসার করিবার মানস করিয়াছ, ইহা বড়ই আহ্লাদের বিষয়, কেননা বহু বিবাহে গৃহ অশান্তির আলয় হইয়া উঠে, নিদান আমার তাই বিশ্বাস।"

বিবাহের অল্পকাল মধ্যে তিনি সরকারী চাকরী গ্রহণ করেন ও কি কারণে পদত্যাগ করলেন তাহা পূর্বেই বলা হয়েছে। কর্মে ইস্তফা

দিয়েই দেশভ্রমণে বাহির হন—কিন্তু সেই ভ্রমণে তাঁর শরীর শোধ-রান দূরে থাক্ তিনি ক্লিষ্ট ক্লান্ত রোগগ্রস্ত হয়ে বাড়ী ফিরে আসেন। এই যে তাকে রোগে ধরল্ তার হস্ত হতে তিনি আর মুক্ত হতে পারলেন না। এই জীর্ণ শীর্ণ রুগ্ন শরীরে তাঁর শেষজীবন অতিবাহিত হয়। তাঁর উপর দিয়ে কত ডাক্তারী, হাকিমী চিকিৎসা পরীক্ষিত হল কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। একজন হাকিম মুক্তাচূর্ণ ঘটিত এক বহুমূল্য ঔষধ প্রস্তুত করে আনে ও তিনি সেই ঔষধ সেবন করেন কিন্তু তাঁহার মূল্যের অনুরূপ গুণের কোন পরিচয়ই পাওয়া গেল না। তাঁর সেই পীড়িত অবস্থায় আমি তাঁর সঙ্গে এঁড়েদহ বাগানে কিছুদিন বাস করেছিলুম, ক্রমে তার পীড়া বৃদ্ধি হতে লাগল। তাঁর শরীর ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে এল, অবশেষে আমাদের সকলকে শোকসাগরে ভাসিয়ে অকালে কালগ্রাসে পতিত হলেন।

গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর (মেজকাকা)

মেজকাকা মহাশয় সুরসিক, অমায়িক সৌখীন পুরুষ ছিলেন। যেন বিলাসিতা মূর্তিমান। তাঁর সখের বাগানটি ফলে, ফুলে সুশোভিত—আঙ্গুর, বাতাবী নেবু, পীচ প্রভৃতি বাছা বাছা ফল, আর চম্পা, চামেলী, মালতী, বেল, জুঁই, রজনীগন্ধা, গোলাপ, বকুল কত রকম সুগন্ধ ফুলের গাছ। একটি ছোট জাতের জুঁই ফুলের ব্যাড়া ছিল, রোজ বিকেলবেলা সেই সব জুঁই ফুল আমরা রাশি রাশি কুড়িয়ে আনতুম। যেমন কলাবিদ্যার প্রতি তেমনি বিজ্ঞানের দিকেও তাঁর আন্তরিক অনুরাগ ছিল। তিনি অনেক সময় বৈজ্ঞানিক Experiments নিয়ে আমোদ করতেন ও আমাদের ডেকে আমোদ দিতেন। রাসায়নিক বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার প্রদর্শনের মধ্যে যা মনে আছে তা হচ্ছে Galvanic Battery-র প্রয়োগ, তাড়িতপ্রবাহ-যোগে আমার যে সর্বাঙ্গ কম্পমান হত সে সহজে ভোলবার নয়। সে সব বৈজ্ঞানিক ভেল্কীবাজীতে আমাদের খুবই আমোদ হত। যেমন বিজ্ঞানে তেমনি সাহিত্যক্ষেত্রেও মেজকাকার গতিবিধি ছিল। তিনি যে কতকগুলি সঙ্গীত রচনা করেছিলেন তার মধ্যে একটি শিখেছিলুম—সে এই :—

ললিত

দুখে গেল সুখনিশি প্রাণনাথ কৈ এল
সুখের শয়ন আজু নয়নজলে ভেসে গেল।
আকাশেরি শোভা তারা, আকাশে মিশাল তারা,
রমণীর দুখতারা সুখতারা প্রকাশিল।

মেজকাকা "বাবুবিলাস" নামে একটি নাটক রচনা করেছিলেন, একবার তার অভিনয় হয়েছিল। তাঁর মোসাহেবের মধ্যে দীননাথ

ঘোষাল বলে একটি চালাক চতুর লোক ছিল সেই 'বাবু' সেজেছিল। অভিনয় কি রকম ওতরাল বিশেষ কিছু বলতে পারি না। আমরা ত আর সে মজলিসে আসন পাইনি, উঁকি ঝুঁকি দিয়ে যা কিছু দেখা। 'কামিনীকুমার' বলে তার একখানি পদ্যোপাখ্যানেরও সেকালে বেশ আদর ছিল।

মেজকাকার সব দিকেই চৌকষ বুদ্ধি ছিল। বিষয়কর্মে তাঁর যে দক্ষতা মহর্ষির আত্মজীবনী থেকে তার কতক পরিচয় পাওয়া যায়।

উপরে দীননাথ ঘোষালের নাম উল্লেখ করেছি। তিনি আমাদের ভারী প্রিয় পাত্র ছিলেন, তাঁকে হাতের কাছে পেলে তাঁর কাছ থেকে রামায়ণ মহাভারতের গল্প আদায় না করে কিছুতেই ছাড়তুম না। তিনিও কথক ঠাকুরের মত গল্পের ঘটায় আমাদের মনোরঞ্জন করতেন। রামায়ণ ও মহাভারত ছেলেবেলায় এইরূপ মুখোমুখি শুনেই আমাদের এক রকম শেখা হয়ে গিয়েছিল।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (বড়দাদা)

ছেলেবলায় বড়দাদা আমার সঙ্গের সঙ্গী ছিলেন, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হেমেন্দ্রনাথ প্রথম বয়সে আমাদের সঙ্গে সমকক্ষভাবে মেশবার অধিকারী ছিলেন না। বড়দাদা যখন খুব ছোট তখন থেকে তাঁর ছবি-আঁকার নৈপুণ্য ও কবিত্ব শক্তি প্রকাশ পায়—কিন্তু হায়! এই দুই বিদ্যার কোনটিই তাঁর জীবনে স্থায়ীভাবে কার্যকরী হল না। তাঁর বাল্যকালের কবিত্বোচ্ছাসে দুইটি কাব্যরত্ন প্রসূত হয়—মেঘদূতের পদ্যানুবাদ ও স্বপ্নপ্রয়াণ; তা ভিন্ন গুম্ফাক্রমণ কাব্য* ও অন্যান্য ছোট খাট কবিতা অনেক আছে যা সেই সময়কার ভারতী প্রভৃতি পত্রিকা খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কি জানি কি কারণে, বাদেগবী চপলা লক্ষ্মীর ন্যায় তাঁর নিকট হইতে সহসা অন্তর্ধান হলেন, বড়দাদা কাব্যামৃতপান হতে বিরত হয়ে তত্ত্ববিদ্যানুশীলনের দুরূহ চিন্তা ও ধ্যানে মগ্ন হলেন, চিত্রকলার চর্চাও ঐখানে থেমে গেল। তত্ত্বজ্ঞান আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে আর দুইটি সৌখিন কলা তাঁর মনোরাজ্য অধিকার করে বসল—বাক্সরচনা প্রণালী, আর রেখাক্ষর বর্ণমালা। এতে এত সময় নষ্ট করা হল কেন? জিজ্ঞাসা করলে বড়দা হেসে বলেন, এ শুধু ছেলেখেলা নয়, এ দুই বিদ্যা সাহিত্যেরই অঙ্গীভূত। লিখতে বসলে লেখবার নানা সরঞ্জাম চাই, কাগজ, কাগজ রাখবার বাক্স, পকেট বই—এই সকল সামগ্রী আগে থাকতে সংগ্রহ করতে হয়—তাই লেখাপড়ায় দিনকতক ক্ষান্ত দিয়ে বড়দা লেখবার জিনিষ তয়েরির কাজে মন দিলেন। একদিকে যেমন

---

* পড়ে যেই লোক এই শ্লোক, পায় সে গুম্ফলোক ইহার পরে।
যথা গুম্ফধারী ভারি ভারি, গোঁপের সেবা করি সুখে বিচরে॥

৺রাজনারায়ণ বসুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই কাব্য রচিত হয়।

কাগজের কারুকার্য, অন্যদিকে লিখন প্রণালী সংস্কারের প্রতি মনোনিবেশ করে রেখাক্ষর বর্ণমালার সৃষ্টি করলেন। সাহিত্য ব্যবসায়ীর যাতে সময় সংক্ষেপ হয় তাই উদ্দেশ্য। এই দুই সখের বিদ্যায় তাঁর বিস্তর সময় ও পরিশ্রম ব্যয় হল। এই দুই বিদ্যা যদিও সামান্য তবু বড়দাদা অসামান্য ধৈর্য ও অধ্যবসায়সহকারে তাদের আয়ত্ত করতে নিযুক্ত রইলেন। তার জন্যে চিন্তা শিক্ষা ও সাধনা যা কিছু প্রয়োজন কিছুই বাকী রাখেন নাই। বাক্সতত্ত্বের জন্য সমুদায় গণিতশাস্ত্র মন্থন করে তাঁর কাজের উপযোগী বিষয় সকল সংগ্রহ করতে হয়েছে, সেই সংক্রান্ত নূতন নিয়মাবলী প্রস্তুত করতে হয়েছে। সেই নব গণিতশাস্ত্র বারংবার সংস্কারের পর এইক্ষণে কোন এক আমেরিকান পণ্ডিতের হস্তে সমর্পিত হয়েছে, পরীক্ষার ফল কি হয় দেখবার জন্য বড়দাদা পথ চেয়ে আছেন। এই ত গেল বাক্স-প্রকরণ। রেখাক্ষর, সেও এক অপূর্ব বস্তু, তাতে কত কবিত্বরস, কতরকম রেখাপাতের কৌশল ছড়াছড়ি, না দেখলে তার মর্যাদা বোঝা যায় না। সম্প্রতি এই রেখাক্ষর পদ্ধতি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়েছে—এ বিষয় কেহ জানতে ইচ্ছা করলে অনায়াসে কৌতূহল চরিতার্থ করতে পারবেন। দুঃখের বিষয় এই যে তাঁর কোন ছাত্র রেখাক্ষর লেখায় এ পর্যন্ত কৃতিত্ব দেখাতে পারলে না। এখনকার সময়ে কোন সুনিপুণ রেখাক্ষর-লেখক পেলে আমরা অনেকে ভাগ্য মনে করি।

আমি বাল্যকালে রেখাক্ষর লিখনপদ্ধতি অভ্যাস করি নাই, কেবল নিজের সংকেত লিপিতে টুকে নিয়ে অনেকানেক বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করেছি। আদিব্রাহ্মসমাজের বেদী হতে পিতৃদেব যে সকল উপদেশ দিতেন সেগুলি বলবার সময় আমি অমনি নোট করে নিতুম, পরে অবসর মতে বিস্তার পূর্বক লিখে দিলে তিনি সংশোধন করে ছাপাতে দিতেন, পর সপ্তাহে সেই ছাপা কাগজগুলি উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে বিতরণ করা হত—সেইগুলি 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখান' আকারে প্রকাশিত হয়েছে। সে সময়ে কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ ব্রাহ্ম-

সমাজে যোগ দিয়েছেন; নূতন নূতন বক্তৃতা, নূতন ব্রহ্মসঙ্গীত—ব্রাহ্মসমাজে যেন নবজীবন সঞ্চার করেছে। ধর্মশিক্ষার জন্য ব্রহ্মবিদ্যালয় নামক একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তাতে কেশবচন্দ্র সেন ইংরাজীতে ও আমার পিতা বাঙ্গলায় উপদেশ দিতেন। পিতৃদেবের প্রদত্ত উপদেশগুলি পূর্বোক্ত প্রণালীতেই লিপিবদ্ধ ও পরে 'ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস' নামক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। আমি ইংলণ্ড যাবার পর পিতৃদেবের বক্তৃতা তুলে নেবার কাজে হেমেন্দ্রনাথ আমার স্থান অধিকার করেন।

বড়দাদা আর আমি দুজনে মিলে কোন কোন সময় গান রচনা করতুম। ব্রহ্মসঙ্গীতের কতকগুলি আমাদের যুক্তরচনা, কতক বা আমাদের নিজস্ব রচনা।

তা ছাড়া বড়দাদা অনেকগুলি ভাল ভাল হেঁয়ালি রচনা করেছিলেন। তার অনেক ভুলে গিয়েছি; দু একটি যা মনে আছে তা এই :—

১। বল দেখি তিন অক্ষরের কথা,
প্রথম অক্ষরদ্বয়ে সবে যায় বাঁধা
শেষ দু অক্ষরে আর সবে যায় বেঁধা ;
সবটাতে দুইপারে—বেঁধা আর বাঁধা
মূর্খে কি বলিতে পারে পণ্ডিতের ধাঁধা।—(রসিক)

২। বল দেখি দুটি ফল,—
তার ভিতরে পাওয়া যায়
ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু সকল।—(বেল-কুল)

৩। ইংরাজিতে বলে যাহা প্রথম অক্ষর,
বাঙলায় তাহা বলে দ্বিতীয় অক্ষর,
প্রথমে দ্বিতীয়ে তথা জানায় আপত্তি,
সবতাতে ঘাড়নাড়ে, বিষম বিপত্তি।

দু অক্ষরে ফল এ কি বল দেখি ভাই,
কেহ বলে বড় মিষ্টি কেহ বলে চাই।—(নোনা)

বড়দাদা আমাদের বাড়ীর কবি ছিলেন। আমাদের অনেক ঘরাও কথা তাঁর কবিতার মধ্যে স্থান পেত। তিনি তাঁর স্বপ্ন-প্রয়াণ কাব্যে আমাদের ভাইদের এইরূপ বর্ণনা করেছেন্ ঃ—

ভাতে যথা সত্য হেম, মাতে যথা বীর,
গুণজ্যোতি হরে যথা মনের তিমির।
নব শোভা ধরে যথা সোম আর রবি,
সেই দেব-নিকেতন আলো করে কবি।

পণ্ডিত মহাশয়

যখন উপর হতে প্রচণ্ড পণ্ডিত
ডাকিতে লাগিল হয়ে বিষম কুপিত,
হাসিখুসি ঘুরে গেল তখন সবার
দল সাথে ম্লান মুখে চলেন সদ্দার।
পণ্ডিত মুহূর্ত পরে আইল সেখানে।
চশমা বাহির করে পরে সাবধানে॥
খসবার ভয়ে তাহা পরিল কসিয়া,
তার পরে যুত করে লইল বসিয়া।
শিষ্যদের আরম্ভিল পরে শিক্ষা দিতে ;
ভুত পালাইয়া যায় কথার ভঙ্গিতে।
"এস দেখি তোমাদের দেখি একবার।
তোমাদের সঙ্গে হল পেরে ওঠা ভার।
আজ কাল তোমাদের অনিয়ম ভারি,
বাবুকে না বলে আর থাকিতে না পারি॥"

"ভারি নাকি অনিয়ম" ছাত্র এক কয়।
পণ্ডিত হাসিয়া বলে "অনিয়ম নয়?
লজ্জা করে না তোমার বলিতে ওকথা?
পড়াশুনা ত্যাগ করি ছিলে সব কোথা?
দেখ দেখি চেয়ে কত হইয়াছে ব্যালা?
ছি ছি ছি বিদ্যার প্রতি এত অবহেলা।
যাও পড়ে কাজ নাই, কর গিয়ে খ্যালা।"
এই বলে ঘাড় ধরে দিল এক ঠ্যালা॥
কৈলাস মুখুয্যে ছিল বসে এক কোণে,
মুচকি মুচকি হাসি সব কথা শোনে।
একজন চুপে কহে "হাসিছ যে বড়?"
কৈলাস ইঙ্গিতে কহে "কর্তা খাপা বড়!"

তেতালায় দুপুর রাত্রি

গভীর নিশীথ মাঝে বাজে দ্বিপ্রহর।
শ্রমশান্তি সুধাপানে মজে চরাচর॥
নিশির উদার স্নেহে ঢালি দিয়া বুক।
ভুঞ্জিতেছে বসুমতী বিশ্রামের সুখ॥
শূন্যে করে তারাগণ জ্যোতির সঞ্চার।
গাছপালা ঝোপে ঝাপে লুকায় আঁধার॥
কে কোথায় পড়ি আছে কোন চিহ্ন নাই।
নিদ্রায় মগন সবে নিজ নিজ ঠাঁই॥
কীটপতঙ্গের মাঝে খদ্যোত কেবল,
পঞ্চভূত মাঝে বায়ু শিশির শীতল,
জীবের শরীরে আর নিশ্বাস পতন,
এই কয়ে যা আছয়ে জীবের লক্ষণ॥

বরাহনগর উদ্যানে

নিশি অবসান প্রায়, সুখে সবে নিদ্রা যায়,
শয্যা কেহ ছাড়িতে না চাহে।
ঘা দিয়া হৃদয় মাঝে, মঙ্গল আরতি বাজে,
বেণুধ্বনি কি মধুর তাহে ॥
দ্বিজরাজ হেন বেলা, বাহির হল একেলা
হর্ম্ম হতে সুরম্য উদ্যানে।
নিঃশব্দ তরঙ্গবতী চলে গঙ্গা স্রোতস্বতী
সনমুখ দিয়া সিন্ধু পানে ॥
শশী অস্ত যায় যায় কি দুর্দ্দশা হায় হায়
কেবা তার দুরবস্থা দেখে।
এমন যে বন্ধু তারা, স্বচ্ছন্দে এখন তারা
তারে ফেলে যায় একে একে ॥
স্নিগ্ধ অতি এই কাল, নাহি কোন গোলমাল
নিস্তব্ধ ব্রহ্মাণ্ড সমুদয়,
ঝোপ ঝাপে অন্ধকার, নভস্থল পরিষ্কার
লতাপাতা হিমবিন্দুময় ॥
পরপার যায় দেখা, যেন এক চিত্রলেখা,
পশ্চিম দিগন্তে নভসীর।
গাছে গাছে একাকার, মাঝে মাঝে রহে আর
দেবালয় প্রাসাদ কুটীর ॥
শাখাপত্র দুলাইয়া, জলপুঞ্জ ফুলাইয়া,
বুলাইয়া মাঠ ময়দান,
মৃদুমন্দ বায়ু বহে মনে মনে দ্বিজ কহে,
আহা কি সুন্দর এই স্থান ॥

শান্তিনিকেতন

শান্তিনিকেতন, শান্ত সুশোভন,
সুভদ্র হরিত ক্ষেত্র শ্যামাকান্ত নিভৃত কানন।
বিমল শোভায়, সরোবর ভায়,
নভসীর বনশ্রীর স্বচ্ছ দরপণ।

আমি যে পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করতুম বড়দাদা তার কাছে পড়তেন না;—তাঁর সংস্কৃত অধ্যাপক ছিলেন রামনারায়ণ পণ্ডিত, 'বহুবিবাহ' নাটক রচয়িতা। তাঁর শিক্ষাগুণে বড়দাদা সংস্কৃতকাব্যে শীঘ্রই ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। সংস্কৃত পদ্যে একটি কলিকাতা বর্ণনা আছে সে তাঁর সেই সময়কার রচনা। তার কয়েকটি শ্লোক আমার যা মনে আছে তা এই :—

কলিকাতা

ইংরাজ রাজরাজ্যং যৎ ত্রিলোকীতলবিশ্রুতং
রাজধানীং সুবিস্তীর্ণাং কলিকাতাং বিভর্ত্তি তৎ।
পয়ঃ পূরপ্রবাহিন্যা গঙ্গয়া পুণ্যসঙ্গয়া
কলিকাতা পুরী ভাতি নিত্যং মেখলিনীব সা।

রথ্যা রম্যাঃ সুগম্যাশ্চ যত্র ভান্তি সহস্রশঃ
দৃতিপাত্রগলদ্বারি-নিবারিতরজশ্চয়া
শতঘ্নীশতযুক্তেন দুর্গেণ দুর্গহারিভিঃ
উদ্যৎ বিদ্যুৎপ্রভাজাল সৈন্যশস্ত্রাস্ত্রশোভিনা।

ত্রিলোক বিশ্রুত এই ইংরাজ রাজ্যের মাঝে
সুবিস্তীর্ণা রাজধানী কলিকাতা কিবা সাজে।
পূর্ণকায়া পুণ্যতোয়া জাহ্নবী বাহিয়া যায়,
তারি অঙ্গে কলিকাতা মেখলিনীসম ভায়।
সুরম্য সুগম্য যথা শতপথ ব্যাপি রয়,
চর্মপাত্র গলদ্বারি ধূলিরাশি নিবারয়।

শত শত তোপযুক্ত দুর্গ্রহ দুর্গ রক্ষিত,
উদ্যৎ বিদ্যুৎপ্রভাসম সৈন্যাস্ত্রশস্ত্রসজ্জিত ॥

বড়দাদা সংস্কৃত ছন্দে অনেক বাঙ্গলা কবিতা রচনা করেছেন, তার কয়েকটি নমুনা দিচ্ছি :—

প্রভাত বর্ণনা

বৃক্ষগণ হেলিত সুশীতল সমীরণে,
পুষ্প যত প্রস্ফুটিত পুষ্পময় কাননে।
মত্ত মধুপায়িদল আইল ত্বরা করি,
জাগিল বিহঙ্গকুল ভাগিল বিভাবরী।

টঙ্কাদেবী

ইচ্ছা সম্যক্ জগ দরশনে কিন্তু পাথেয় নাস্তি,
পায়ে শিক্লী মন উড়ু উড়ু একি দৈবের শাস্তি।
টঙ্কাদেবী করে যদি কৃপা না রহে কোন জ্বালা,
বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই কিছু না খালি ভস্মে ঘি ঢালা।

মন্দাক্রান্তা

ইঙ্গবঙ্গের বিলাত যাত্রা

বিলাতে পালাতে ছটফট করে নব্য গৌড়ে,
অরণ্যে যে জন্যে গৃহগ বিহগ প্রাণ দৌড়ে,
স্বদেশে কাঁদে সে গুরুজন বশে কিছু হয় না,
বিনা হ্যাট্‌টা কোট্‌টা ধুতি পিরহনে মান রয় না।১
পিতা মাতা ভ্রাতা নব শিশু অনাথা ছুট করি,
বিরাজে জাহাজে মসি মলিন কুর্তা বুট পরি,
সিগারে উদ্‌গারে মুহুর মুহু ধূমলহরী
সুখ স্বপ্নে আপ্নে মুলুকপতি মানে হরি হরি।২

বিহারে নীহারে বিবিজন সনে স্কেটিঙ করি,
বিষাদে প্রাসাদে দুখিজন রহে জীবন ধরি।
ফিমেলে ফিমেলে অনুনয় করে বাড়ি ফিরিতে,
কি তাহে, উৎসাহে মগন তিনি সাহেব গিরিতে।৩
ফিরে এসে দেশে গল কলর বেশে হটহটে,
গৃহে ঢোকে রোখে উলগতনু দেখে বড় চটে,
মহা আড়ী সাড়ী নিরখি চুলদাড়ী সব ছিঁড়ে
দুটা লাথে ভাতে ছরকট করে আসন পিঁড়ে।৪

শিখরিণী

(রেখাক্ষর বর্ণমালা হইতে)

বসন্ত।

মধু ঋতু এল ধরণী মাঝে
হেলে দোলে লতা মোহন সাজে॥
অমৃত বরিষে মৃদু সমীর
পরাণ লভয়ে মৃত শরীর॥
ঝুরু ঝুরু ঝুরু বহিছে বায়॥
ঝরিয়া পড়িছে বকুল তায়॥
মধু মালতীর ফুটিছে কলি—
চারিদিকে তার ঘুরিয়া অলি
গুন্ গুনায়িছে নব রসিক।
পহরে পহরে কুহরে পিক॥
ফুলের কে পায় কুল কিনারা
অগণন যেন গগন তারা॥
তরো তরো ফুল রঙ বেরঙ
শতেক ফুলের শতেক ঢঙ

কেহ বা দোলে কেহ বা ঝোলে
কেহ বা গন্ধে মাতায়ে তোলে ॥
কদম ছড়ায় কনক রেণু
রাখাল যথায় বাজায় বেণু ॥
রাশি রাশি ফুলে ভরিল সাজি।
ঘরে ফিরে চল আর না আজি ॥

কৃষ্ণের বিরহে।

কৃষ্ণ গেছে গোষ্ঠ ছাড়ি রাষ্ট্র পথে হাটে
শুষ্কমুখ রাধিকার দুঃখে বুক ফাটে ॥
আনন্দের বৃন্দাবন আজি অন্ধকার,
গুঞ্জরে না ভৃঙ্গকুল কুঞ্জবনে আর ॥
কদম্বের তলে যায় বংশী গড়াগড়ি,
উপুড় হইয়া ডিঙ্গা পঙ্কে আছে পড়ি ॥
কালিন্দীর কূলে বসে কাঁদে গোপনারী
আর কি সে মনোচোর দেখা দিবে চক্ষে,
সিন্ধি কাঠি থুয়ে গেছে বিন্ধাইয়া বক্ষে ॥
এত বলি হাহু করে বাষ্প আর মোছে।
সবারই সমান দশা কেবা কারে পোছে ॥

মুখ-হস্তের অভিন্নতা।

মুখে হাতে ভেদ নাই সাক্ষী তার তিন।
ভুজঙ্গ বিহঙ্গ আর মাতঙ্গ প্রবীণ ॥
ভুজঙ্গের মুখখানি (বরজিয়া দাঁত)
কি সুন্দর মনোহর সুকোমল হাত ॥
সাপুড়ের তুর্মি যবে বাজে ঘুরি ঘুরি।
কেমন ঘুরায় হাত গোখুরা গোখুরী ॥

হাতের কায়দা দেখি সবে বলে "বা জী !"
শেখ্যাও করিতে কিন্তু কেহ নহে রাজী ॥
বিহঙ্গের চঞ্চুহাত কম নহে বড় ।
ছলা-কলা না জানুক কাজে খুব দড় ॥
কেউটে গোখুরা আদি মহা মহা ফণী,
সারসের চঞ্চুহাতে ধোঁড়া যায় বনি ।
হস্তীর হস্তটি এ যে মুখেরই লেজুড়,
জানে না অবোধ লোকে তাই বলে শুঁড় ॥
খগে নাগে সাক্ষী মানি লেখে তাই শাস্ত্রে—
ভেদ নাই মুখে হাতে, দশনে নখাস্ত্রে ॥

মনুয়া ।

জাতিতে যদিও বনের টিয়ে
রতন মানিক মনুয়াটি এ ॥
ছার কোয়েলিয়া ছার পাপিয়া ।
মনুয়াটি মোর লাখ রুপিয়া ॥
কেবা জানে কুহু কে জানে পিউ ।
গাহে রসভরে চাহে যা জিউ ॥
কাণে যাহা শুনে ছু একবার,
মন থেকে তা নড়ে না আর ॥

পেন্সিল-প্রকরণ ।

লেখনী গুজিয়া কাণে পেন্‌সিল্ ধর ।
এখন লেখ যা বলি—লেখ "হর হর" ॥
পেন্‌সিল্ করিতে হয় অত কি ছুঁচালো ?
অতিসূক্ষ্মে কোন কাজ উতরে না ভাল ॥

সহজ মধ্যম সুরে বাঁধিবে সেতার।
সপ্তমে বাঁধিলে হবে সামলানো ভার ॥
বেশী খাদ ভাল না, ভাল না বেশী জিল।
না সরু না মোটা করি কাটিবে পেন্‌সিল ॥
রেখাক্ষর হবে তবে আজ্ঞার অধীন।
চাপ দিলে মোটা হবে—ঢিল দিলে ক্ষীণ ॥
পেন্‌সিল্‌ খণ্ড তোমার মাসেক দুমাস—
নলপত করিয়া চলিবে যেন হাঁস ॥
কালের গতিকে তাহা হয়ে গেলে আধা,
অবাধে চলিবে যেন রজকের গাধা ॥
ঐ জন্তুটির মত মাস চারি খাটি
নূতন পেন্‌সিল্‌ দণ্ড লবে যবে কাটি
তখন তাহাকে হবে থামানো কঠিন।
ছুটিবে—পরাণ ভয়ে যেমতি হরিণ ॥

সাধন পদ্ধতি।

কেমনে পাকাবে হাত শুন সাবধানে ;
শিষ্য জুটাইয়া আনি মন্ত্র দিবে কাণে।
শিষ্যটিরে কাছে ডাকি সম্ভাষিয়া মিষ্ট
সারস্বত যোগাসনে হয়ে উপবিষ্ট—
লেখনী করিয়া হাতে সাজিবে লেখক,
শিষ্যটি হইবে আর উত্তর সাধক ॥
আউড়িবে সে ধীরে ধীরে সমাচার পত্র।
তুলিতে থাকিবে তুমি ছত্র পিছু ছত্র ॥
ছিটা ফোঁটা দিবে না রেখাই যবে টানি
সঙ্গ গুণে তরি যাবে অঙ্গহীন বাণী ॥

রেখার পোকামাকড় কৃমি বিটকাল,
উচ্চিংড়ি ফড়িং পিঁপড়া পালে পাল,
ক্ষান্ত হোক রোসো আগে করি কিলিবিলি ;
ধীরে সুস্থে কোরো শেষে ফুটকুনি বিলি।
এক মেটে করিয়া করিবে কাজ ফতে।
দো মেটে করিবে শেষে অবকাশ-মতে॥

সিদ্ধিলাভ।

প্রথমে প্রথম খণ্ডে পাকাইবে হাত।
দ্বিতীয় খণ্ডের তবে উলটিবে পাত॥
মস্তকে মথিয়া লয়ে পুস্তকের সার।
হস্তকে করিবে তার তুরুক সোয়ার॥
হইবে লেখনী ঘোড়-দোউড়ের ঘোড়া।
আগে কিন্তু পাকা করি বাঁধা চাই গোড়া॥

বড়দাদা গদ্যেও প্রবন্ধাদি অনেক লিখেছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সে সমস্ত একস্থানে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয় নাই। তাঁর গদ্য-লেখা সামান্যতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে—দার্শনিক ও সামাজিক। তাঁর সর্বপ্রথম দার্শনিক প্রবন্ধ 'তত্ত্ব-বিদ্যা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় কিন্তু সে অনেক কালের কথা, গ্রন্থখানি এখন পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। সম্প্রতি কয়েকমাস ধরে 'গীতাপাঠ' নামক যে প্রবন্ধগুলি 'প্রবাসী' মাসিকপত্রিকায় আমরা ঔৎসুক্যসহকারে পাঠ করেছি—গীতাশাস্ত্রের এই যে অপূর্ব মৌলিক ব্যাখ্যা—এটি সম্পূর্ণ অবয়বে যখন বেরবে, তখন ইহা গীতাধ্যায়ীদের পরম আদরের সামগ্রী হবে সন্দেহ নাই। 'তত্ত্ব-বিদ্যা' হতে আরম্ভ করে এই 'গীতাপাঠ' যদি সমাপ্তির মধ্যে গণ্য করা যায়—এই দুইয়ের মাঝখানে বড়দাদার লিখিত বিবিধ দার্শনিক প্রবন্ধ আছে, যেমন "সারসত্যের আলোচনা" "বিদ্যা এবং জ্ঞান", "হারামণির অন্বেষণ" "দ্বৈতা-

দ্বৈতবাদ", "বিবৃতিবাদ" (evolution), "বৌদ্ধধর্মের ঘাত-প্রতিঘাত" ইত্যাদি—এদের কতক ছোট ছোট পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছে, কতক বা সাময়িক পত্রে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রয়েছে। উহাদের মধ্যে কোন কোন প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ—হয়ত কোন একটা বিষয়ের অবতারণা করে তার আদ্যোপান্ত লিখে শেষ করা হয়নি, কোনটা অর্দ্ধাঙ্গ, কোনটা বিকলাঙ্গ, ভগ্নাবস্থায় অমনি পড়ে আছে—এ সকল ভাল করে দেখে শুনে গড়েপিঠে নেওয়া আবশ্যক। দার্শনিক ছাড়া সামাজিক প্রবন্ধও অনেক এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে, যেমন সোনার কাটি রূপোর কাটি, আর্য্যামি ও সাহেবিয়ানা, একটি প্রশ্ন ও উত্তর ইত্যাদি অনেকগুলি সারগর্ভ ও সুপাঠ্য। বড়দার এই লেখাগুলি উদ্ধার হয় আমার অনেকদিনকার সাধ—কিন্তু মনের ইচ্ছা মনেতেই রইল—তা পূর্ণ হবার কোন পন্থা দেখছিনে। আসল কথা হচ্ছে—এ ভার নেয় কে? দুটি লোক আমার মনে হচ্ছে—তাঁর সুযোগ্য পুত্র ধীমান্ সুধীন্দ্রনাথ এবং পৌত্র শ্রীমান্ দিনেন্দ্রনাথ, এরাই এই ভারগ্রহণের অধিকারী এবং উপযুক্ত-পাত্র। উভয়েই সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যজগতে স্বনামখ্যাত,—উভয়েরই সময় আছে, সামর্থ্য আছে, এই কার্যে যা যা চাই সকলি আছে—এঁরা বড়দাদার লেখাগুলির সম্পাদকীয় ভারগ্রহণ করুন এই আমার একান্ত অনুরোধ। এ অনুরোধ কি ইঁহারা রক্ষা করবেন না? সাহিত্য ভাণ্ডারের এই বহুমূল্য রত্নগুলি প্রলয় সাগরে ডুবিতে দেওয়া কি লজ্জার কথা নহে?

পদ্যই বল, গদ্যই বল, বড়দাদার লেখার যে একটি মাধুর্য, প্রসাদগুণ, একটি বিশেষত্ব, একটি মৌলিকতা আছে তা তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি, অন্য কোথাও দেখা যায় না। দুরূহ দার্শনিক তত্ত্ব সকল অতি সহজ ভাষায় জলের ন্যায় প্রাঞ্জলভাবে লিখে যাওয়া তাঁর এক আশ্চর্য ক্ষমতা। তাঁর লেখাসকল যে পর্যন্ত নিরক্ষর সামান্য লোকেরও বোধগম্য না হয় সে পর্যন্ত তিনি সন্তুষ্ট থাকেন না। তাই

কখন কখন আমরা দেখতে পেতুম তাঁর বড় বড় লেখা যার কিছুমাত্র অক্ষরজ্ঞান নেই এমন লোককে ডেকে শোনাতে তিনি উৎসুক—তাদের না শুনিয়ে তৃপ্ত হতেন না। যদিও তারা শোনবামাত্র ভাবগ্রহণ করতে পারত কি না বলা শক্ত। এই সম্বন্ধে একটি মজার গল্প আছে। আমাদের একটি পুরাণো দাসী (শিশুকালে যে আমাকে মানুষ করেছিল), আমরা সকলে তাকে 'কাল দাই' বলে ডাকতুম—বড়দাদা তাকে তাঁর 'স্বপ্নপ্রয়াণ' থেকে একটি কবিতা শোনাচ্ছিলেন; তার কানে তা ঠাকুর দেবতার কথার মত কি যে সুধামাখা মিষ্টি লাগল সে ভক্তির সহিত গড় হয়ে প্রণাম না করে আর থাকতে পারলে না।

বড়দাদার কাছ থেকে কার্যগতিকে অনেক দিন পৃথক হয়ে পড়েছি কিন্তু তাঁর স্মৃতি আমার জীবনের সঙ্গে জড়িত, কখনই বিলুপ্ত হবার নয়। সে ভালবাসা, সেই অট্টহাস, শিশুর ন্যায় সেই সরল অন্তঃকরণ ক্ষণে তুষ্ট ক্ষণে রুষ্ট, পুরাণো সে দিনের সে সব কথা কি কখন ভোলা যায়? তে হি নো দিবসাগতাঃ—সত্য কিন্তু মনোরাজ্যে সে সব দিন চিরদিনই জ্বলন্ত রয়েছে। আমাদের সেকালের দুএকটি ঘটনা মনে হচ্ছে। বড়দাদার একটি ভৃত্য ছিল, তার নাম কালী। তার উপর কত রাগ, কত তম্বী, কত ঝড় তুফান গালি বর্ষণ হচ্ছে, আমরা দেখছি অনেক সময় অকারণে; চসমা খুঁজে পাচ্ছেন না। তাকে কত ধমকান হচ্ছে, চীৎকার ধ্বনিতে আকাশ ফেটে যাচ্চে অথচ সেই চসমা হয়ত নিজের পকেটে—পকেটে বলাটাও ঠিক হল না, তাঁর চোখের উপর কপালে ঠ্যাকান রয়েছে—আমরা দেখিয়ে দিলে শেষে হেসে অস্থির। এদিকে এক হাতে যেমন তিরস্কার, পরক্ষণে অন্য হাতে তেমনি পুরস্কার। এইরূপ ক্ষতিপূরণের কাজ চলেছে, কালীও এই গালি গালাজ চড়টা চাপড়টায় কোন ভ্রূক্ষেপ না করে মনের সুখে কাজ করে যাচ্ছে।—বড়দাদার ভোলা স্বভাবের দরুণ যে কত লোক বিপদে পড়ত তার ঠিক নেই। হয়ত কাউকে খাবার নিমন্ত্রণ করেছেন

সে যথাসময়ে এসে উপস্থিত কিন্তু বড়দাদার কিছুই মনে নেই—তাকে খাওয়ান দূরে থাকুক তার সামনেই নিজের খাবার খেয়ে যাচ্ছেন অথচ তাকে তার ভাগ দেবার কোন কথাই নেই। সে বেচারা প্রতীক্ষা করে আছে কখন তার জন্যে খাবার আসে—এদিকে রাত হয়ে যাচ্ছে —শেষে বড়দাদার ভুল ভেঙ্গে গেলে হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি পড়ে গেল।—একজন বড়দাদার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে—বড়দাদা ঠিক সেই সময় বেরবার উদ্যোগে আছেন—তাঁর বন্ধুর গাড়ী নিজের গাড়ী মনে করে তাতে চড়ে বেরিয়ে পড়লেন, সে বন্ধু বসেই আছে—অনেকক্ষণ পরে বাড়ী ফিরে এসে দেখেন তাঁর বন্ধু এখনো সেখানে বসে—বড়দাদা শেষে কারণ জানতে পেরে অপ্রস্তুত ও হাসতে হাসতে তাঁর বন্ধুর পীঠ চাপড়ে তাকে সান্ত্বনা করলেন। বনের জন্তু পাখী বশ করবার বড়দাদার আশ্চর্য ক্ষমতা, যেমন সাধু তুকারামের কথা শোনা যায় সেই রকম। তিনি সকালে তাঁর এজলাসে বসে আছেন আর কত চড়াই, সালিক ও অন্য পাখী তাঁর কাছে এসে তাঁর হাত থেকে খাচ্ছে—'চড়াই পাখী চাউল খাকী আয়না ঠোকরাণা' এই আদুরে ভাষায় চড়াইকে ডাকছেন। কত কাঠবেড়ালী তাঁর গায়ের উপর দিয়ে নির্ভয়ে চলে যাচ্ছে। ইন্দুরও খাবার ভাগ পায়। কাকের তো কথাই নেই ওরা 'নাই' পেলে ত মাথায় চড়বেই কিন্তু কাককে প্রশ্রয় দিলে অন্য পাখীদের উপর জুলুম করা হয়। একদিন তিনি বিরক্ত হয়ে একটা দাঁড় কাককে মেরে তাড়িয়ে দিতে বলেছিলেন। পরদিন দেখেন সে কাক যথাসময়ে তাঁর মজলিসে হাজির নেই। এই দেখে হুলুস্থূল বেধে গেল! সে কোথায় খোঁজ খোঁজ। খুঁজতে নানা দিকে চর পাঠান হল, তারা গ্যাখে সে কাক কোন্ একটা দূরের গাছে বসে আছে—তাকে আনিয়ে বড়দাদা তবে সুস্থির।

বড়দাদার যা নিত্য নিয়মিত প্রাতঃস্নান ঠাণ্ডা জলে—তা চিরকালই সমান চলেছে—শীতে গ্রীষ্মে রোগে অরোগে তার আর বিরাম নাই। তাঁর জ্বর কি কোন অসুখ হলে সেই স্নান বন্ধ করবার জন্যে

কত সাধ্য সাধনা অনুনয় বিনয় করা যায় কিন্তু ভোরে উঠেই সেই ঠাণ্ডা জলে স্নান কিছুতেই নিবারণ করা যায় না। ঠাণ্ডার বদলে গরম জল কোন কালেই তাঁর মনোনীত হয় না। বড়দাদাকে ব্যামোর সময় ঔষধ পথ্য সেবন করানো এক বিষম দায়। তাঁর লেখায় মগ্ন হয়ে তিনি অনেক সময় আহার নিদ্রার নিয়ম ভুলে যান —এই বয়সে তার শরীরে আর এ অত্যাচার সহ্য হয় না। এখন শরীর সেবায় বিশেষরূপে মনোযোগ দেবার সময় এসে পড়েছে। তিনি নিজেই তা বুঝতে পেরেছেন ;—এক একবার বলেও থাকেন— আর না! কিন্তু কাজে এ কথার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর (মেজদাদা)

ও-বাড়ীর মেজদাদার সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। তখন এ-বাড়ী ও-বাড়ীর কোন প্রভেদ ছিল না, আমরা তাঁকে আমাদের সহোদর ভাইয়ের মতন দেখতুম। তিনি ছিলেন মেজদাদা, আমি সেজদাদা বা সেজবাবু, আর বড়দাদা, এই তিনজনে সর্বদাই আমরা একত্রে থাকতুম, একসঙ্গে খেলা করতুম—আমরা এই trinity তিনে এক একে তিন। মেজদাদা আমাকে বড় ভালবাসতেন, আমিও তাঁর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলুম। আমরা ছুটিতে তেতালার ছাতে বসে গান করতুম, গল্প করতুম, কোজাগর পূর্ণিমায় হেসে খেলে বাগানে বেড়িয়ে রাত কাটাতুম। মেজদাদা গান বাজনা বড় ভালবাসতেন—তিনি নিজেও অনেক সঙ্গীত রচনা করেছেন—ব্রহ্মসঙ্গীত, জাতীয় সঙ্গীত, ইত্যাদি। "দীননাথ প্রেমসুধা দেহ হৃদে ঢালিয়ে" এ তাঁর গান। তিনি সব দিকে চৌকোষ ছিলেন—সামাজিকতা, লোক-লৌকিকতা, বড়দাদার যে দিকটা অভাব ছিল, তিনি সেই সকল গুণে পূর্ণমাত্রায় ভূষিত ছিলেন।

আমি বোম্বায়ে কার্যারম্ভ করবার কিছু পরে কলিকাতায় এক 'স্বদেশী' মেলা প্রবর্তিত হয়। বড়দাদা নবগোপাল মিত্রের সাহায্যে মেলার সূত্রপাত করেন, পরে মেজদাদা তাতে যোগদান করায় প্রকৃতপক্ষে তার শ্রীবৃদ্ধি সাধন হল। কলিকাতার প্রান্তবর্তী কোন একটি উদ্যানে বৎসরে বৎসরে তিন চারিদিন ধরে এই মেলা চলতো। সেখানে দেশী জিনিষের প্রদর্শনী, জাতীয় সঙ্গীত, বক্তৃতাদি বিবিধ উপায়ে লোকের দেশানুরাগ উদ্দীপ্ত করবার চেষ্টা করা হত। এই মেলা উপলক্ষে মেজদাদা কতকগুলি জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেন আর সেই মেলাই আমার ভারত সঙ্গীতের জন্মদাতা—

মিলে সবে ভারত সন্তান
একতান মনপ্রাণ,
গাও ভারতেরি যশোগান।

এদিকে সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যায় যেমন তাঁর পারদর্শিতা ছিল, সে সময়কার সাহিত্যিকদের মধ্যেও তিনি অগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁর প্রণীত "বিক্রমোর্বশী" নাটকের একটি সুন্দর অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র গগনেন্দ্রনাথ এইটি উদ্ধার করে সাহিত্য সমাজে প্রচার করেছেন দেখে আমার অত্যন্ত আহ্লাদ হয়েছে। তাঁর লিখিত কতকগুলি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ছিল—আমি এক সময়ে তাঁর হাতের লেখা পুঁথি দেখেছি, আর তিনি আমাকে পত্রেও লিখেছিলেন যে ভারত ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা লিখতে আরম্ভ করেছেন—মোগল সাম্রাজ্য মনে হচ্ছে ;—আক্ষেপের বিষয় যে এ সব লেখা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল, কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না—'কোন খানে লেশ, নাহি অবশেষ, সেদিনের কোন চিহ্ন।'

নাট্য অভিনয় বিষয়েও মেজদাদার বিশেষ উৎসাহ ছিল। আমি ইংলণ্ড থেকে ফিরে আসবার দুই বৎসর পরে ছুটী নিয়ে কলকাতায় এসে দেখি তাঁদের বাড়ীতে 'নবনাটক' অভিনয়ের প্রভূত আয়োজন হয়েছে—আমি সেই সমারোহের মধ্যে এসে পড়ি। রঙ্গমঞ্চে যবনিকার শিরোবেষ্টনী বিক্রমসভার নবরত্নের নামে অঙ্কিত—

ধন্বন্তরি ক্ষপণকামরসিংহ শঙ্কু-
বেতালভট্ট ঘটকর্পর কালিদাসাঃ
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য।

নবনাটকখানি রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত, বহুবিবাহপ্রথায় পারিবারিক দুঃখজ্বালা অশান্তি প্রকটন সূত্রে লোকশিক্ষা দেওয়া ঐ নাটকের উদ্দেশ্য। আমাদের বাড়ীর ছেলেরা আত্মীয় স্বজন বন্ধু সেই

নাটকের পাত্রপাত্রী সেজেছিলেন। মেয়ের পার্ট অবিশ্যি পুরুষের নিতে হয়েছিল। আমার পিতা এই অভিনয়ের সংবাদ পেয়ে কালীগ্রাম হতে মেজদাদাকে লিখেছেন; (৪ মাঘ ১৭৮৮ শক, ১৬ই জানুয়ারী ১৮৬৭)।

"তোমাদের নাট্যশালার দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে—সমবেত বাদ্য দ্বারা অনেকের হৃদয় নৃত্য করিয়াছে—কবিত্ব রসের আস্বাদনে অনেকে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে। নির্দোষ আমোদ আমাদের দেশের যে একটি অভাব, তাহা এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইবে। পূর্বে আমার সহৃদয় মধ্যমভায়ার উপরে ইহার জন্য আমার অনুরোধ ছিল, তুমি তাহা সম্পন্ন করিলে। কিন্তু আমি স্নেহপূর্বক তোমাকে সাবধান করিতেছি, এ প্রকার আমোদ যেন দোষে পরিণত না হয়।"

আমাদের বন্ধু অক্ষয় মজুমদার নাট্যের প্রধান নায়ক গবেশবাবু সেজেছিলেন—নাট্য অভিনয়ে সেই তাঁর প্রথম উদ্যম; পরে তিনি ঐ ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর আরো উৎকর্ষ লাভ করেছিলেন—তাঁকে ছেড়ে আমাদের কোন অভিনয় সিদ্ধ হত না। হাস্যরসের অভিনয়ে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন।

এই নবনাটক আর মানময়ী নামক একটি গীতিনাট্য সর্বপ্রথম আমাদের বাড়ীতে অভিনীত হয়। পরে অলীকবাবু, হঠাৎ নবাব প্রভৃতি আরো অনেকগুলি নাটকের অভিনয় হয়। 'বাল্মীকি প্রতিভা' আর 'রাজা ও রাণী' এই দুই নাট্য আমাদের বাড়ীর মেয়ে পুরুষ সকলে মিলে গড়ে তোলা গিয়েছিল।

এক সময় ছিল যখন আমাদের বাড়ী আত্মীয় স্বজনে পূর্ণ ছিল। এ-বাড়ী ও-বাড়ীর সকলে আমরা একান্নপরিবারভুক্ত ছিলুম। ক্রমে পৃথক হয়ে পড়লুম। মেজদাদা ও আমাদের মধ্যে যখন বিভাগ হল আমার মনে ভারি বেদনা লেগেছিল। আমরা তেতলার বাড়ীতে

ছিলাম—দোতালায় এসে পড়লুম। এই দোতালার বাড়ীই আমাদের আদিম বসদ্বাটী, তেতালার বাড়ী নির্মাণ পরে হয়। বাড়ীর বাগান ভাগ হয়ে গেল, পুকুরটা বুঝি সাধারণ রইল। একদিন দেখি হাই-কোর্টের একজন জজ এসে আমাদের বাড়ী তন্নতন্ন তদারক করে দেখে গেলেন, কি প্রণালীতে বিভাগ হবে তাই ঠিক করবার জন্যে। এই ছাড়াছাড়ি আমি অনেককাল ভুলতে পারিনি। ইংলণ্ড থেকে অনেক সময় দুঃখ করে মেজদাদাকে এই ধরণে পত্র লিখতুম। বাল্যকাল হতে আমরা একত্রে ছিলাম—তুমি ছিলে মেজদাদা আর এখনো পর্যন্ত আমার ছোটরা আমাকে সেজদাদা বলে ডাকে। আমাদের এক সঙ্গে ওঠাবসা, খ্যালাধূলা, আমোদ প্রমোদ, আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই যে আমাদের মধ্যে বিবাদ বিচ্ছেদ মতান্তর উপস্থিত হবে। কত কু-লোকের মন্ত্রণায় এক এক সময় এইরূপ সুখের সংসার ছারখার হয়ে যায়। যাহারা পরিবারের ভিতরে এইরূপ অশান্তির বীজ ছড়াইবার চেষ্টা করে তাহাদের মত দুর্মতি আর কে আছে? এক একবার দময়ন্তীর মত অভিশাপ দিবার ইচ্ছা হয়, যখন নলরাজা তাঁহাকে অরণ্যে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছেন—

অপাপচেতসং পাপো য এবং কৃতবান্ নলং
তস্মাদ্ দুঃখতরং প্রাপ্য জীবত্বসুখজীবিকাং।

"অপাপচিত্ত নলকে যে পাপাত্মা এইরূপ কার্যে প্রবৃত্ত করিল, সে তদধিক দুঃখতর জীবিকা পাইয়া জীবনধারণ করুক।"

বিলেত থেকে ফিরে এসে বোম্বাই যাবার পর মেজদাদার সঙ্গে বড় আমার দেখা শুনো হত না কিন্তু আমাদের পত্র-ব্যবহার বন্ধ হয় নাই। ইংলণ্ড বোম্বাই আমি যেখানেই থাকি তাঁকে চিঠি লিখতুম আর তাঁর কাছ থেকেও স্নেহপূর্ণ পত্র পেতুম। ছুটিতে কলকাতায় এলে অবিশ্যি আমাদের ঘন ঘন দেখা সাক্ষাৎ হত। একবার আমি বাতরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় দেড় বৎসরের ব্যামোর

ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছিলুম। সেই বাতে অনেক দিন শয্যাগত ছিলুম, তখন মেজদাদা সর্বদাই আমাকে দেখতে আসতেন, আদর যত্ন করতেন, গল্পসল্পে আমার মনোরঞ্জন করতেন। আমার একটি আরামের চৌকি ছিল তার চারিদিকে বন্ধুবান্ধবেরা ঘিরে বসতেন, ঠিক যেন একটি দরবার বসেছে। আমার মনে হত ব্যামোর ভিতরেও যদি এত আরাম পাওয়া যায়, তাহলে ব্যামোয় পড়াতে আপত্তি কি ?

O Pain ! where is thy sting ?

মেজদাদার অল্প বয়সেই মৃত্যু হয়। যে তাঁকে ভাল করে জানত সেই তাঁর গুণে মুগ্ধ হত, তাঁর কেমন একটি আকর্ষণী শক্তি ছিল। অনেকে তাঁর উপর অনেক আশা ভরসা স্থাপিত করেছিলেন। ছোটকাকার তাঁর উপর কিরূপ স্নেহ মমতা ছিল তা আমরা তাঁর পত্রে দেখতে পাই। মেজদাদার বিদ্যাশিক্ষার পাছে কিছুমাত্র অযত্ন হয় এই তাঁর ভাবনা। তিনি একপত্রে বলেছিলেন-- "মানুষের মন রত্নখনি বিশেষ। সেই রত্নটিকে নিয়ে মেজে ঘসে উজ্জ্বল করলে তবে তা মূল্যবান্ হয়--মনের উপর শিক্ষার কার্যও ঐরূপ।" ভবিষ্যতে গণেন্দ্রনাথ আমাদের গৃহস্বামী হয়ে পরিবারের কল্যাণসাধনে নিযুক্ত থাকবেন এই আশায় তিনি আশ্বস্ত ছিলেন ; কিন্তু হায় ! তাঁর সে আশা পূর্ণ হল না। যাঁরা ভাল লোক দেবতারা শীঘ্রই তাঁদের আপনাদের কাছে ডেকে নিয়ে যান, তাই তাঁর পিতার মৃত্যুর অনতিকাল পরে তিনিও অকস্মাৎ আমাদের সকলকে ছেড়ে পুণ্যলোকে চলে গেলেন।

Requiescat in peace ! তাঁর আত্মার শান্তি হোক !

নবগোপাল মিত্র

উপরে যে জাতীয় মেলার কথা বলেছি তার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন নবগোপাল বাবু। তিনি হিন্দু স্কুলে আমার সহাধ্যায়ী ছিলেন, স্কুল ছেড়ে আমাদের সহকর্মী হলেন; আমাদের মধ্যে প্রণয় ও ঘনিষ্ঠতা আরো বাড়ল, তিনি সর্বদা আমাদের বাড়ীতে যাওয়া আসা করতে লাগলেন। তিনি ভারী চালাক চতুর, খুব একজন কাজের লোক ছিলেন। তিনি একটা অশ্বশালা খুলেছিলেন, তাকে সবাই বলত নবগোপালের Circus, তাতে আমরা কেউ কেউ ঘোড়ায় চড়া শিখতে যেতুম। 'Indian Mirror' পত্র যখন আমার পিতৃদেবের হাত হতে হস্তান্তর হল, সেই পত্রের প্রতিযোগী 'National Paper' বলে একটা ইংরাজি সাপ্তাহিক পত্র আমাদের বাড়ী থেকে বেরতে লাগল, নবগোপাল বাবু তার সম্পাদক হয়েছিলেন। 'ব্রাহ্ম-বিবাহ' আইন যখন বিধিবদ্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল তখন যাঁরা আদি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ সমর্থন করবার জন্য সিম্‌লার পাহাড়ে প্রেরিত হন, নবগোপাল বাবু তাঁদের মুখপাত্র ছিলেন। আদি সমাজের বিরুদ্ধাচরণের ফলে দাঁড়াল এই যে, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি প্রচলিত কয়েকটি প্রধান প্রধান ধর্মসম্প্রদায়ের বাইরে না গেলে আর রেজিষ্ট্রী বিবাহ সিদ্ধ হয় না। সুতরাং আমাদের মধ্যে যাঁরা এই আইনের শরণাপন্ন হতে চান তাঁরা আপনাদের অহিন্দু বলে প্রকাশ্যে পরিচয় দিতে বাধ্য। এই আবর্তের মধ্যে পড়ে এখন আমরাই আর্তনাদ ছাড়ছি—এই অহিন্দু Declaration উঠিয়ে দিয়ে বিবাহ আইন সংস্কারের জন্য সচেষ্ট হয়েছি। কিন্তু এখন আমাদের হাজার চেষ্টাতেও কোন ফল হচ্ছে না।

বোম্বাই থেকে আমি একবার ছুটিতে কলকাতায় এসে বোম্বাই

প্রদেশের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, ধর্মসম্প্রদায়, তীর্থস্থান,— ইত্যাদি বিষয়ে একটা সভায় বক্তৃতা দিয়েছিলুম—ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। সেই বক্তৃতায় আমি কথায় কথায় বলেছিলুম বাঙালীদের যেমন প্রধান আহার ভাত ওদেশে সেরূপ নয়, ভাতের ব্যবহার আছে বটে কিন্তু সাধারণ লোকের মধ্যে বেশীর ভাগ রুটিই প্রচলিত, কোথাও বজরী (বজরা), কোথাও জোয়ারী বা গমের হাত-গড়া রুটি! ভাতই আমাদের যেমন প্রধান খাদ্য ওদেশে তেমনি রুটি। এই ভাতখোর ও রুটিখোর, দুই জাতির মধ্যে বলিষ্ঠ কোন জাতি? এই প্রশ্ন উঠল। আমি বলেছিলুম ভারতবর্ষের অন্যান্য অনেক জাতির তুলনায় বাঙালী দুর্বল! আবহাওয়ার গুণাগুণ এই পার্থক্যের এক কারণ হতে পারে, আহারের তারতম্যও আর আর কারণের মধ্যে ধরা অসঙ্গত হয় না। যব ও গমের মত ভাত পুষ্টিকর খাদ্য নয়, সুতরাং ভাতখোর বাঙালী যে দুর্বল তাতে আর বিচিত্র কি? এই কথা শুনে নবগোপাল বাবু মহা চটে উঠলেন। তিনি চীৎকার করে আপনার অমত প্রকাশ করে বল্লেন, "তা কখনই হতে পারে না। তোমরা যাই বল, আমরা একবার ভাত খাব, দুবার ভাত খাব, তিনবার ভাত খাব।" এ তর্কের আর কোন উত্তর নেই। "সভা হল নিস্তব্ধ।"

তখনকার কালে নবগোপাল ন্যাশনাল দলের দলপতি ছিলেন। তাঁরি নেতৃত্বে জাতীয় মেলা সফলতা লাভ করেছিল; দুঃখের বিষয়, সে উৎসাহ অধিক দিন স্থায়ী হল না, শীঘ্রই নিবে গেল। এই স্বদেশী ভাবের যে পুনরুদ্দীপন হয়েছে এভাব যদি দেশময় বিস্তার লাভ করে শাশ্বতকাল স্থায়ী হয়, তাহলেই দেশের মঙ্গল প্রত্যাশা করা যায়।

পূর্বে বলেছি যে, পূর্বে আমরা দুই কাকার সঙ্গে একান্নবর্তী পরিবারভুক্ত ছিলাম। তখন ঠাকুর পরিবারের অন্যান্য শাখার মধ্যেও যথেষ্ট সদ্ভাব ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। ভিন্ন ভিন্ন বাড়ীর ছেলেরা আমাদের

বাড়ীর দালানে গুরুমশায়ের কাছে ক খ শিখতে আসত। গুরুমশায়ের কাছে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষায় হাতে খড়ি। সেই উগ্রচণ্ডা গুরুমশায় বেত্রহস্তে শেখাতে বসেছেন, কখনো বা সে বেত তাঁর কোন ছাত্রপৃষ্ঠে চালিত হচ্ছে—সে চিত্র মন থেকে কখনো যাবে না। আমরা গুরুমশায়কে কি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মনে করতুম—ঠিক যেন Goldsmith-এর সেই গ্রাম্য গুরুমশায়—

And still they gazed and still
The wonder grew
That one small head could
Carry all he knew.

অবাক হইয়া দেখে, না জানি কি করে
অত বিদ্যা ওই ক্ষুদ্র মাথার ভিতরে।

আমরা গুরুমশায়ের কাছে ক খ, বানান নামতা, কড়াঙ্কে, ষটকে—এই সব শিখতুম, তাছাড়া চিঠিপত্র লেখা অভ্যাস করতুম। যত ওঁচা ফ্যালা, জিনিষ মোড়বার মত ব্রাউন কাগজ আনা হত,—শ্রীরামপুরের সাদা কাগজ যেদিন আসত খুব ভাগ্যি মনে করতুম। এই কাগজের উপর বাঙলা কলম দিয়ে আঁচড়কাটা—সেই আমাদের পত্রলেখা। যতদূর মনে আছে পত্রের দুই পাঠ ছিল—'সেবক শ্রী' আর 'আজ্ঞাকারী শ্রী'—দিনের পর দিন বদলে বদলে এই দুই পাঠ লেখা হচ্চে। এখন দেখতে পাই বাঙলা চিঠিতে পাঠ লেখা বড় সহজ ব্যাপার নয়। বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুজন, স্নেহের সম্পর্কীয় কনিষ্ঠ ছোট বড় আত্মীয় স্বজন বন্ধু, অপরিচিত দূরের লোক, formal informal!—বাংলায় কাকে কি পাঠ, ও কোন্ সময় কি পাঠ লিখতে হয় সে এক বিষম সমস্যা। গুরুমশায় এই বিষয় আমাদের মনোযোগ দিয়ে শেখালে ভবিষ্যতে অনেক কাজ দেখত। তবে ওরূপ মূর্খ পণ্ডিতের কাছে বেশী কিছু প্রত্যাশা করা অন্যায়, আমরা ঐ গুরুর কাছে লেখাপড়া বেশী দূর না এগিয়ে থাকি—নিদেন গোড়া পত্তন সেই।

উপনয়ন

নয় বৎসর বয়সে আমার উপনয়ন হয়, ঘটনাটি বেশ মনে পড়ে। কর্ণভেদ শিরোমুণ্ডন এগুলি যদিও ভাল লাগেনি কিন্তু নাপিতের উপর বিদ্রোহাচরণ করেছিলুম বলে মনে হয় না। হবিষ্যান্ন ভোজনে বেশ তৃপ্তি লাভ করতুম, ভালই হোক মন্দই হোক রোজকার ডাল-ভাতের চেয়ে রুচিকর। ভিক্ষার ঝুলি কাঁদে করে 'ভবতি ভিক্ষাং দেহি' বলে উপবীতধারী ব্রহ্মচারী সাজা, তিন দিন ঘরে বন্ধ হয়ে থাকা—পাছে শুদ্রের মুখ দেখে ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হয়, এই চিরন্তন হিন্দু-প্রথা অনুসারে আমার পইতা হল। কারাবাস হতে মুক্তির পর ন্যাড়া মাথায় বাড়ীময় ঘুরে বেড়ানো আর সকলের কাছ থেকে ব্রহ্মচারী বলে অভিবাদন পাওয়া—মনে মনে কত গর্ব হচ্ছে—যেন আমি কি একটা ধনুর্ধর হয়েছি, অথচ ব্রহ্মচর্য কাকে বলে মানবক সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। ব্রহ্মচর্যের ব্যাখ্যা করে আমাদের পুরুত-ঠাকুর কোন উপদেশ দেন নাই। কেহ আমাদের বলে নাই, 'আচার্যা-ধীনো বেদমধীস্ব'—আচার্যাধীন হইয়া বেদাধ্যয়ন কর,—অথবা 'অধীহি, ভোঃ সাবিত্রীং মে'—আমার নিকট গায়ত্রী শিক্ষা কর। 'মা দিবা স্বাপ্সীঃ'—দিবানিদ্রা যেয়ো না বলে আমাদের কেহ সাবধান করে দেয়নি, আমরা ও আরামের জিনিষটা অনেকদিন পর্যন্ত আঁকড়ে ধরেছিলুম। তিন দিন ঘরে বন্ধ থাকা যে দ্বাদশ বৎসর গুরুকুলে বেদাধ্যয়ন করা—তা আমরা বুঝি নাই—ব্রাহ্মণ-শুদ্রের মধ্যে যে জাতিগত পার্থক্য (বৈদিককালে যেমন আর্য আর দস্যুর মধ্যে) সেই ভেদবুদ্ধি ফুটিয়ে তোলা যদি ঐ নিয়মের উদ্দেশ্য হয়, সেটা সিদ্ধ হয়েছিল বলতে হবে। কতকগুলি সন্ধ্যার মন্ত্র আবৃত্তি করতে শিখেছিলুম তার মানে না বুঝে। এখন দেখছি যে শব্দগুলি আওড়াতুম তার অর্থ—বারিবন্দনা।

ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ শমনঃ সন্তু কূপ্যাঃ
শন্ন সমুদ্রিয়া,—কুয়ার জল আমাদের মঙ্গল করুক ইত্যাদি। কূপোদককে কথা শোনানো সহজ, সে জল পরিষ্কার রাখা আমাদেরই হাতে ; কিন্তু সমুদ্র সকল সময়ে রাস মানেন না, টাইটানিক জাহাজ ডুবিই তার জ্বলন্ত প্রমাণ ! এই সন্ধ্যা দুবার আবৃত্তি করবার নিয়ম ; কিন্তু ঐ নিয়ম বেশিদিন পালন করেছিলুম বলে বোধহয় না। তবে আমরা মহর্ষির উপদেশে জানলুম যে উপবীত গ্রহণের মুখ্য তাৎপর্য গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষা। তা হতেই আমাদের নূতন জন্ম—তখন থেকে আমরা দ্বিজ। ব্রহ্মসাধনের অঙ্গরূপে গায়ত্রী মন্ত্রের উপর পিতৃদেবের কতটা আস্থা ছিল তা তাঁর আত্মচরিতে দেখতে পাই। তিনি বলছেন "পুরুষানুক্রমে আমরা এই গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আসিতেছি। এই মন্ত্র আমাদের শিরায় শিরায়। যদিও আমি বুঝিলাম যে ব্রহ্মউপাসনার জন্য গায়ত্রী সাধারণের পক্ষে উপযুক্ত নহে, কিন্তু আমি সেই সাবিত্রী দেবীকেই ধরিয়া রহিলাম, কখনো পরিত্যাগ করিলাম। না। গায়ত্রীর গূঢ় ভাবার্থ আমার মনে দিন দিন আরো প্রকাশ হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে 'ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ' আমার সমস্ত হৃদয়ে মিশিয়া গেল। ইহাতে আমার দৃঢ় নিশ্চয় হইল যে, ঈশ্বর আমাকে কেবল মূক সাক্ষীর ন্যায় দেখিতেছেন তাহা নহে। তিনি আমার অন্তরে থাকিয়া অনুক্ষণ আমার বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন। ইহাতে তাঁহার সহিত একটি ঘনিষ্ঠ জীবন্ত সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইল।"

আমাদের মধ্যে উপনয়ন প্রথা সাধারণতঃ যে ভাবে প্রচলিত আছে তাহা অর্থহীন আড়ম্বর মাত্র। বৈদিক ক্রিয়া সংক্ষেপে সারিয়া ফেলা—ঐ ক্রিয়ার সারভাগ পরিত্যাগ করে যেন শুধু খোলসটা রাখা হয়েছে। পিতৃদেব যে ভাবে উপনয়নকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেছেন তাতে প্রাচীন প্রথার কাছাকাছি যতটা রাখা যেতে পারে তার চেষ্টা

করা হয়েছে আদি ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠান পদ্ধতির উপনয়ন-ভাগ দেখিলেই তাহা স্পষ্ট বোধগম্য হয়।

এই অনুষ্ঠানে গায়ত্রী মন্ত্রের শ্রেষ্ঠতা রক্ষিত হয়েছে। ব্রহ্মচারীর প্রতি উপদেশে এই মন্ত্রের বিশদ ব্যাখ্যা দৃষ্ট হবে। সেই উপদেশের সারমর্ম এই ঃ

"গায়ত্রী মন্ত্র তোমাদের ইহকালের অবলম্বন, পরকালের সম্বল। সেই মন্ত্র দ্বারা ঈশ্বরকে মনন করিবে, তাঁর জ্ঞান শক্তি ধ্যান করিবে। ওঁ বলিয়া ব্রহ্মকে অন্তরে জানিবে এবং ভূর্ভুবঃ স্বঃ বলিয়া স্বর্গমর্ত অন্তরীক্ষ বহির্জগতে তাঁহার আবির্ভাব দেখিবে। তিনি এই বিশ্বসংসার রচনা করিয়া আমাদের কাহারো নিকট হইতে দূরে নাই—তিনি আমাদের অন্তরে থাকিয়া আমাদের প্রত্যেককে শুভবুদ্ধি প্রেরণ করিতেছেন—'ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ'।" গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থ এই।

পূজা

আমাদের বাড়ী দুর্গা ও জগদ্ধাত্রী—এই দুই পূজা হত। দুর্গোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হত। আমাদের উঠানের উপর সামিয়ানা খাটানো আর তিন দিন ধরে নৃত্য গীত আমোদ প্রমোদ, আমাদের আনন্দের আর সীমা থাকতো না। সেই তিন দিন আমরা যেন কল্পনাপ্রসূত এক নূতন রাজ্যে বাস করতুম—নূতন দেশ, নূতন ঋতু, আলো বাতাস সব নূতন। প্রথমে যখন প্রতিমার কাঠাম নির্মাণ আরম্ভ হত তখন থেকে শেষ পর্যন্ত সমুদায় নির্মাণ-কার্য আমরা কৌতূহলের সহিত পর্যবেক্ষণ করতুম। আমাদের চোখের সামনে যেন ছোটখাট একটি সৃষ্টি কার্য চলেছে। প্রথমে খড়ের কাঠাম তার উপর মাটি, খড়ির প্রলেপ তার উপর রং, ক্রমে চিত্র বিচিত্র খুঁটি নাটি আর আর সমস্ত কার্য, সবশেষে অর্ধচন্দ্রাকৃতি চালের পরে দেবদেবীর মূর্তি আঁকা, তাতে আমাদের চোখের সামনে বৈদিক, পৌরাণিক দেবসভা উদ্‌ঘাটিত হত। ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, কৃষ্ণলীলা, রাম-রাবণের যুদ্ধ, কৈলাসে হর-পার্বতী, নন্দী ভৃঙ্গি, হনুমান ও গন্ধমাদন, বীণাহস্তে নারদ মুনি, গরুড়বাহন বিষ্ণু, বিষ্ণুর অনন্ত শয্যা, নৃসিংহ অবতার, কিন্নর-গন্ধর্ব-মিলিত ইন্দ্রসভা, গীতায় একাদশ সর্গে যেমন বিশ্বলোকের বর্ণনা আছে, আমাদের এই এই চর্ম চক্ষে সেই বিশ্বলোক আবিষ্কৃত হত। রাংতা দিয়ে যখন ঠাকুরদের দেহমণ্ডন, বসন ভূষণ সাজসজ্জা প্রস্তুত হত, আমাদের দেখতে বড়ই কৌতূহল হত। লক্ষ্মী সরস্বতীর চমৎকার বেশভূষা। লম্বোদর গজানন, গণেশ ঠাকুরের মূষিক তাঁর স্থূল দেহের আড়ালে লুকিয়ে থাকত; কিন্তু কার্তিকের প্যাখম-ধরা ময়ূরের যে বাহার তা কহতব্য নয়। কার্তিক ঠাকুরের অপূর্ব সাজসজ্জা তাঁর গুম্ফজোড়া আকৃতি, বেশভূষা, ফিনফিনে শান্তিপুরে ধুতি—দেখে মনে হত যেন

একজন বাঙ্গালী বাবু ময়ূরের উপর এসে অধিষ্ঠান করেছেন। মহিষাসুর বেচারার অবস্থা বড় শোচনীয়, সিংহের কামড়ে তার দক্ষিণ হস্ত অসাড়, এদিকে আবার সিংহবাহিনী দশভুজার বর্শাবিদ্ধ হওয়ায় তার আর নড়ন চড়ন নেই, এ সত্ত্বেও তার মুখে Milton-এর সয়তান সদৃশ কেমন একটা অদম্য বীরত্ব ফুটে বেরচ্ছে।

পূজার সময় যাত্রা হত। কত রকম যাত্রাব দল এসে মহল্লা দিত, তাদের মধ্যে যা সেরা তাই বেছে নেওয়া হত। যাত্রায় বহু-লোকসমাগম হত, উঠানটা লোকে লোকারণ্য। আমরা আদ্যোপান্ত সমস্তটা দেখতে পেতুম না, কেবল প্রথম ও শেষ ভাগে এসে বসতুম। প্রহ্লাদ চরিত্রে যে ছেলেটি প্রহ্লাদ সাজত তার বড় মিষ্টি গলা, তার গানে সকলে মোহিত হয়ে যেত। প্রহ্লাদ কত প্রকার উৎপীড়ন সহ্য করছে, আমরা তার দুঃখে অশ্রুপাত করতুম। এত উৎপীড়নেও তার ভক্তির স্খলন নেই। সে আপনাকে শোধরাবার কত চেষ্টা করছে কিন্তু সহস্র চেষ্টাতেও তার চিরকালের অভ্যাস কোথায় যাবে।

কালী কালী বলে ডাকি সদা এই বাসনা
অভ্যাস দোষেতে তবু কৃষ্ণ বলে রসনা।

কিন্তু যাত্রার গানের চেয়ে আমাদের সং দেখতে বেশী আমোদ হত। রামায়ণের পালাতে সঙের আসল ঘটা—এদিকে রাবণ কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি রাক্ষসের দল, ওদিকে আবার রামের বানর সৈন্য,—সবই সঙ্গীন ব্যাপার। আমরা সারারাত কিছু সভায় থাকতুম না, রাত্রিশেষে আমাদের ঘুম থেকে উঠিয়ে আনা হত। কোন ভাল অদ্ভুত রকম সং আসছে তাই দেখবার জন্যে আমরা তাড়াতাড়ি উঠে আসতুম। দেখতে দেখতে তিন দিন চলে গেল—বিজয়া এল, প্রতিমা ভাসান দিতে নিয়ে যাবে—কি আপশোষ! দুর্গা অশ্রুপূর্ণ নয়নে বিদায় নিয়ে চল্লেন, মনে হত সত্যিই দেবীর চক্ষে জল এসেছে। বিজয়ার দিন প্রত্যূষে আমাদের গৃহ-গায়ক বিষ্ণু আগমনী ও বিদায়ের

গান করতে আসতেন। যাত্রার গান যেমন প্রাকৃত বিষ্ণুর তেমনি Classical—সে কি চমৎকার ঠেকত, শুনে শ্রোতৃমণ্ডলী মোহিত হয়ে যেত। বিষ্ণুর একটি আগমনী গান আমার এখনো মনে আছে—

আজু পরমানন্দ আনন্দ ! মম গৃহে আলো।
যাও যাও সহচরী
আন ডেকে পুরনারী
বরদারে বরণ করি বিলম্বে কি ফল।

এস উমা করি কোলে,
মাকে মা কি ভুলে ছিলে,
এত দিন পরে এলে বুঝি মনে ছিল।

মা হয়ে মমতা মার,
জাননা গো উমা আমার
পাষাণ স্বভাব তোমার কিছু থাকা ভাল ॥

তখনকার পূজার আমোদ প্রমোদ যাত্রা উৎসবের মধ্যে সাত্ত্বিক ভাব, আধ্যাত্মিকতা কি ছিল এক একবার ভাবি। দালানে গিয়ে সন্ধ্যার আরতি দেখতে যেতুম, তাতে ধূপধুনা বাদ্যধ্বনির মধ্যে আমরা ঠাকুরকে প্রণাম করে আসতুম। এত বাহ্য আড়ম্বরের মধ্যে এই যা ভিতরকার আধ্যাত্মিক জিনিস। আমাদের বৈষ্ণব পরিবারে কি ভাগ্যি পশুবলির বীভৎস কাণ্ড ছিল না সেই রক্ষা—পশুর বদলে কুমড়া বলি হয় এই শুনতুম। আধ্যাত্মিক ভাবের আর যা কিছু দেখা যেত সে বিজয়া দশমীর বিসর্জন উপলক্ষে। বিজয়ার রাত্রে শান্তিজল সিঞ্চন ও ছোটবড় সকলের মধ্যে সদ্ভাবে কোলাকুলি, এই অনুষ্ঠানটি বাস্তবিক হৃদয়গ্রাহী মনে হত,—'মধুরেণ সমাপয়েৎ' এই বাক্য যেন ঠিক ফলেছে।

এই পৌত্তলিক উপাসনার মধ্য হতে আস্তে আস্তে অলক্ষিত ভাবে আমাদের পরিবারে অমূর্তের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হল। অল্প বয়স থেকেই মূর্তিপূজার উপর আমার কেমন বিতৃষ্ণা ছিল—যাকে ইংরাজাতে বলে 'Iconoclast' আমি তাই ছিলুম—তার কারণ পৈত্রিক সংস্কারই বল—আর যাই বল। এক সময়ে আমাদের বাড়ী সরস্বতী পূজা হত। মনে আছে একবার সরস্বতী প্রতিমা অর্চনায় গিয়েছি—শেষে ফিরে আসবার সময় আমার হাতে যে দক্ষিণার টাকা ছিল তাই দেবীর উপরে সজোরে নিক্ষেপ করে দে ছুট! তাতে দেবীর মুকুট ভেঙ্গে পড়ল। এই অপরাধে তখন কোন শাস্তি পেয়েছিলুম কি না মনে নাই, কিন্তু হাতে হাতে সাজা না পেয়ে থাকি তার ফলভোগ এখন বুঝতে পারছি। বাঁশীতে ছিদ্র দেখা দিয়েছে। আমার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ক্ষয়ে যাচ্ছে—স্মৃতিভ্রংশ হতে আরম্ভ হয়েছে। আমি যে আমার সর্বিসের সর্বোচ্চ শিখরে উঠতে পারিনি সেও ঐ কারণে। সরস্বতী প্রসন্ন থাকলে হাইকোর্টের আসন অধিকার করে পদত্যাগ করতে পাতুম—আমার ভাগ্যে আর তা হল না!

ব্যায়াম

ছেলেবেলায় আমাদের ব্যায়াম চর্চার অভাব ছিল না। ভোরে উঠে যোড়াসাঁকো থেকে গড়ের মাঠ বরাহনগর প্রভৃতি দূর দূর পাল্লা পদব্রজে বেড়িয়ে আসতুম। সেই আমাদের Morning Walk—তাছাড়া ঘোড়ায় চড়া, Cricket, সাঁতার দেওয়া এ সব ছিল। আমাদের বাড়ীতে একটা পুকুর ছিল, তাতে আমরা অনেক সময় সাঁতার দিতে যেতুম। বাজী রেখে সাঁতার দেওয়া আমাদের এক রকম খেলা ছিল আমরা তিন ভায়ে মিলে যেতুম—কলার গাছ আমাদের ভেলা। সেই ভেলায় চড়ে মাঝখান পর্যন্ত গিয়ে দেখা যেত কে কাকে সিংহাসনচ্যুত করতে পারে। সেই কলার বাহন কেড়ে নেওয়া চাই—আরোহী সাধ্যমত চেষ্টা করছে আততায়ীকে হটিয়ে দিতে—চোখে জল ছিটিয়ে হোক আর যে কোন উপায়েই হোক তার আক্রমণ হতে আপনাকে রক্ষা করতে হবে।—বলপূর্বক সেই কলাবাহন যে দখল করতে পারবে তারই জিৎ। এই রকম সাঁতারে আমরা খুব পরিপক্ক হয়ে উঠেছিলুম। বাবামশায়ের সঙ্গে যখন গঙ্গায় ব্যাড়াতে যেতুম তখন সাঁতার দিয়ে স্নানে আমার বিশেষ আমোদ হত। আমি সাঁতার দিতে দিতে অনেক দূর পর্যন্ত চলে যেতুম বাবা-মশায় তাতে কোন আপত্তি করতেন না, বোধ করি যদিও এক এক-বার তাঁর মনটা অস্থির হয়ে পড়ত।

বড়দাদা সাঁতারে সর্বাপেক্ষা মজবুত ছিলেন। তাঁর রেখাক্ষরের মত সাঁতারেও তিনি যে কত রকম কারদানী করতেন তার ঠিক নেই। যখন গঙ্গার ধারের বাগানে থাকতেন তখন মাঝে মাঝে সাঁতার দিয়ে গঙ্গাই পার হতেন; আর সকলে ভয়ে অস্থির হয়ে পড়ত।

হীরাসিং বলে এক পালওয়ানের কাছে আমরা কুস্তী শিখতুম।

তাতে আমার খুব উৎসাহ ছিল। ডনের পর ডন, বড় বড় মুগুর ভাঁজা—আর কত রকম কুস্তীর দাঁও, মার পেঁচ শিক্ষা। আমি কুস্তীতে একজন ওস্তাদ হয়ে উঠেছিলুম। কেউ আমার সঙ্গে সহজে পেরে উঠত না। হীরাসিংহের চ্যালাদের মধ্যে অনেক আমার সমবয়স্ক ছিল, তাদের সঙ্গে আমার কুস্তি হত—তাদের মধ্যে যারা বড় তাদেরও আমার কাছে হার মানতে হত; সহজে কেউ আমাকে ধরাশায়ী করতে পারত না। অথচ আমার বল যে বেশী তা নয়—এই কুস্তীতে শুধু বলীর জয় তা নয়, ছলে বলে কৌশলে যে কোন প্রকারে প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করতে পারলেই জিৎ। একদিন কুস্তী করতে করতে বেকায়দায় পড়ে আমার হাত মুচকে গিয়েছিল। কাউকে কিছু না বলে সেটা ঢেকে রাখবার চেষ্টা করা গেল। আমার ওস্তাদের টোটকা ওষুধে সেরে যাবে এই ভেবে ছোলা ভিজিয়ে হাত বেঁধে রাখলুম; কিন্তু তাতে কোন ফল হল না। শেষে ডাক্তার সাহেবের রীতিমত চিকিৎসায় তবে আরাম হল। তখন থেকে সেবারকার মত আমার কুস্তী বন্ধ। এই সব বিষয়ে আমি অল্পেতে সন্তুষ্ট থাকতুম না, সবাই বলত "যা করবে সব তাতেই বাড়াবাড়ি—এ তোমার কেমন স্বভাব।" তার ফল ভোগও করতে হত—হাত পা ভাঙ্গা, মাথা ভাঙ্গা, কত বিপত্তি যে আমার উপর দিয়ে গিয়েছে তার অন্ত নেই। অথচ এখনো পর্যন্ত ত বেঁচে আছি। এত প্রকার বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে শিশুজীবন যে কি করে রক্ষা পায়, বিধাতার এ এক আশ্চর্য বিধান। সে যাহা হোক, একথা বলা যেতে পারে কোন বিষয়েরই বাড়াবাড়ি ভাল নয়'—এটা বড় ঠিক কথা। অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রমে অনেক সময় উল্টা উৎপত্তিই হয়। তার সাক্ষী আমাদের ওস্তাদ হীরাসিং। তার কুস্তীর বিরাম নেই, যখনই দেখি কোন না কোন কঠোর ব্যায়ামে নিযুক্ত; কিন্তু তার শরীর বেশী দিন টিঁকল না, শীঘ্রই ভেঙ্গে পড়ল। শুনেছি এই সব পালোয়ানেরা দীর্ঘজীবী হয় না। শরীর রক্ষা করতে হলে আহার

বিহার ব্যায়াম এ সকল বিষয়ে মিতাচারী হওয়া আবশ্যক। গীতানির্দিষ্ট মধ্যপথই প্রশস্ত—

যুক্তাহার বিহারস্য যুক্ত চেষ্টস্য কর্ম্মসু
যুক্ত স্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা।

নিয়মিত আহার বিহার, নিয়মিত কর্ম চেষ্টা, নিয়মিত নিদ্রা ও জাগরণ—ইহাতেই দুঃখহারী যোগ সাধন হয়।

শিক্ষা

আমি ইতিপূর্ব্বে পাঠশালায় গুরুমশায়ের কাছে আমার প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলেছি, তার পরের ধাপ হচ্ছে পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন। পিতৃদেব যে চারজন পণ্ডিতকে বেদশিক্ষার জন্যে কাশীতে পাঠান—বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার তার মধ্যে একজন। ইনিই আমার সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন। যদিও আমার শিক্ষক, কিন্তু এঁর উপাধির উপযুক্ত পাণ্ডিত্যের যদি সার্টিফিকেট দিতে হয় তাতে আমার সঙ্কোচ বোধ হবে। এঁর শিক্ষাগুণে সংস্কৃতশাস্ত্রে আমার যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মেছিল তা বলতে পারি না। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের 'সহর্ণের্ঘঃ 'চপোদিতা কানিতার্ণঃ' প্রভৃতি সূত্র ও তস্য বৃত্তিগুলি কণ্ঠস্থ ও আবৃত্তি করতেই সব সময় যেত। তিনি বলতেন—

'আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী।'

অর্থাৎ আবৃত্তিই সর্বশাস্ত্রের সার, বোঝো আর না বোঝো তাতে কিছু যায় আসে না। কাব্যের মধ্যে রঘুবংশের কয়েক সর্গ বই আর বেশীদূর এগোয়নি। আমি যতদিন বিদ্যালঙ্কারের কাছে সংস্কৃত শিখেছিলুম, ততদিন যদি আর একজন ভাল পণ্ডিতের কাছে,—ওকথা থাক আর গুরুনিন্দা করব না। তাঁর নিকট শিক্ষায় আমার একটা লাভ হয়েছিল স্বীকার করতেই হবে! সংস্কৃত ভাষার বিশুদ্ধ উচ্চারণ এক প্রকার আয়ত্ত করে নিয়েছিলুম। কাশীতে সংস্কৃত অধ্যয়নের ফলে আর কিছু না হোক তাঁর ঐটুকু পাণ্ডিত্য—ঐ উচ্চারণ শুদ্ধিটুকু উপার্জিত হয়েছিল, আর তাঁর ছাত্রও অল্পবিস্তর তার ফলভাগী হয়েছিল। বাঙ্গলা দেশে সংস্কৃত উচ্চারণ যে কি বিকৃত তা সকলেরই জানা আছে, সে উচ্চারণ ত আমার কাণে ভারি অশ্রাব্য ঠ্যাকে। আমাদের বড় বড় দিগ্‌গজ পণ্ডিতদেরও উচ্চারণ শুনলে মাথা হেঁট করতে হয়। আমাদের যেমন একপ্রকার 'বাবু' ইংরিজি

আছে যা নিয়ে ইংরেজেরা বিদ্রূপ করে, তেমনি 'বাবু' সংস্কৃত উচ্চারণ শুনে না জানি তৈলঙ্গী বা মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিতেরা কি মনে করেন! সংস্কৃত কলেজের একজন ভূতপূর্ব অধ্যক্ষের সহিত আমার এই বিষয়ে কথা হয়। আমি বিনীতভাবে নিবেদন করেছিলুম যে, কালেজের বিদ্যার্থীদের বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ শেখাবার একটা সুব্যবস্থার প্রয়োজন। তিনি আমার একথা হুট করে উড়িয়ে দিলেন। বল্লেন্ "এদেশে যে উচ্চারণ চলতি তাই ঠিক—মেড়ুয়াবাদীদের কাছে আমরা আবার উচ্চারণ কি শিখব? আর কোন্ প্রদেশকেই বা উচ্চারণের মানদণ্ড বলে গ্রহণ করা যেতে পারে?"

কিন্তু এ তর্কের মীমাংসা গায়ের জোরে হয় না। সংস্কৃতের কোন বর্ণের কি উচ্চারণ তা পরীক্ষা করবার অনেক উপায় আছে, আর সে পরীক্ষায় বাঙ্গলা-সংস্কৃত উচ্চারণের ভ্যাজাল ধরা পড়বেই। "ভাষা বিজ্ঞানের পারিপাট্যে সংস্কৃত অতুলনীয়। ভাষায় যতগুলি উচ্চারণ ঠিক ততগুলি বর্ণ সংস্কৃত বর্ণমালায় স্থান পাইয়াছে। প্রত্যেক বর্ণের একটিমাত্র নির্দিষ্ট উচ্চারণ।" কিন্তু এদেশে আমরা কি সংস্কৃত বর্ণের যথানির্দিষ্ট উচ্চারণ রক্ষা করি? তা ত নয়। আমরা বর্গীয় জ, অন্তস্থ্য য, দুই ব, মূৰ্দ্ধণ্য ণ, দন্ত্য ন, তালব্য মূৰ্দ্ধণ্য ও দন্ত্য স এই সকল ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের উচ্চারণে কোন প্রভেদ মানি না। যুক্তাক্ষরে প্রতি বর্ণের পৃথক উচ্চারণ না করে বাঙলা ধরণে এক বিকৃত উচ্চারণ করে থাকি; যথা—

কৃষ্ণ (ষ্ ণ)=কিষ্ট। আত্মা=আত্তঁা।
স্নান=স্তান। ক্ষীর (ক্ষীর)=ক্ষীর ইত্যাদি।

অন্ত্যস্থ 'য'র পৃথক উচ্চারণ বাঙ্গলায় আদৌ নাই, যুক্তাক্ষরেও নহে। সংযুক্তবর্ণে 'য'কারের উচ্চারণ হয় না—যে অক্ষরে সংযুক্ত থাকে তার দ্বিরুক্তির মত উচ্চারণ হয়, যেমন—

সত্য=সত্ত। বাদ্য=বাদ্দ ইত্যাদি।

বাঙ্গলার অনেক স্থলে 'অ'কারের উচ্চারণ প্রাকৃত হ্রস্ব 'ও'কারের মত, যথা—অরি অসি ইত্যাদি। সংস্কৃত উচ্চারণের বেলাতেও আমরা এই নিয়ম অনুসরণ করি। বাঙ্গলা উচ্চারণের নিয়ম সংস্কৃত উচ্চারণে আরোপিত হয় বলে এখানে সংস্কৃতের উচ্চারণ এরূপ দূষিত হয়েছে। তাই হয়েছে। তাই বলছি সংস্কৃতের মত ঠিক উচ্চারণ করতে হলে আমাদের রীতিমত সংস্কৃত উচ্চারণ শিক্ষার প্রয়োজন। একথা সত্য যে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সংস্কৃত উচ্চারণের বিশুদ্ধতা কোন কোন অংশে নষ্ট হয়েছে, কিন্তু এ বিষয়ে বাঙ্গলা দেশের কাছে আর সকলেই হার মানতে হয়। এদেশে সংস্কৃত উচ্চারণ যেরূপ বিকৃতি ধারণ করেছে এমন আর কোথাও দেখি নাই। বারাণসী বল, দাক্ষিণাত্য বল, এসকল স্থানের যে কোন পণ্ডিত হোন্ তাঁদের উচ্চারণ যে আমাদের তুলনায় বিশুদ্ধ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দুএকটি ব্যতিক্রম থাকতে পারে; যেমন মহারাষ্ট্রে দেখেছি 'দ'এ 'ন'এ 'জ্ঞ'র উচ্চারণ হয়; কিন্তু সেগুলি ধর্তব্যের মধ্যে নহে। অতএব এ ক্ষেত্রে আমরা নিশ্চয়ই ওসকল স্থানের সংস্কৃতজ্ঞদের গুরুস্থানীয় বলে মেনে নিতে পারি। সে যা হোক্, আমাদের মনে হয় বঙ্গদেশে সংস্কৃতের উচ্চারণ-সংস্কার নিতান্তই প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে এবং আমাদের সংস্কৃতানুরাগী বিদ্বন্মণ্ডলী এবিষয়ে মনোযোগ করুন, এই আমার সবিনয় নিবেদন।

বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত-সাহিত্যে আমার যা কিছু জ্ঞানলাভ হয়, সিবিল সর্বিস পরীক্ষায় সেই বিদ্যাটুকু আমার বিলক্ষণ কাজে এসেছিল। আমার সময়ে সংস্কৃত ও আরব্য ভাষায় ৫০০ মার্ক পূর্ণমাত্রা নির্ধারিত ছিল। এই ৫০০ মার্কের মধ্যে আমি সংস্কৃতে ৩৫০-এরও উপর পেয়েছিলুম। আমার পরীক্ষক ছিলেন ভট্ট মোক্ষমূলর। তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। বোধ করি আমার লেখা পরীক্ষা করবার সময় আমার কাগজটার উপরে একটু সদয়ভাবে চোখ বুলিয়েছিলেন, নইলে অত উচ্চ সংখ্যা পাবার আমার

আশা ছিল না। আমি সিবিল সর্বিস পরীক্ষায় লাটিন গ্রীকের পরিবর্তে আমাদের দুই Classic—সংস্কৃত ও আরবিক নিয়েছিলুম। ওখানকার ছাত্রদের নিজের ভাষায় অথবা ওদের চিরাভ্যস্ত লাটিন গ্রীক ভাষায় যদি আমাকে পরীক্ষা দিতে হত, আর আমাদের ক্লাসিকদ্বয় তালবেতালরূপে যদি আমার সহায় না থাকত তাহলে ঐ পরীক্ষায় আমার জয়লাভের কোন সম্ভাবনাই থাকত না।

ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী

Oriental Seminary-র হেড মাষ্টার ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী আমাদের ইংরাজি শিক্ষক ছিলেন।—ধীর শান্তপ্রকৃতি, সুবিদ্বান—তাঁর কি এক মোহিনী শক্তি ছিল আমরা সহজেই তাঁকে মেনে চলতুম, আমাদের উপর তাঁর কোন জোর জবরদস্তী করতে হত না। আমাদের কাছে তাঁর ডাক-নাম ছিল কেবলমাত্র 'Sir'—'Sir' এসেছেন শুনলেই আমরা গিয়ে হাজির। বিদ্যালয়ে আমাদের যে সকল পাঠ্য পুস্তক ছিল তা ছাড়াও তিনি আমাদের অনেক বই পড়তে দিতেন। তার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য—Gibbon's Decline and Fall—'রোম রাজ্যের অবনতি ও পতন' যার পত্রে পত্রে ঘোরতর রাষ্ট্র-বিপ্লব, রোম সম্রাটের অমানুষিক কাণ্ড-কারখানা—গিবনের মৃদঙ্গগম্ভীর ভাষায় পড়ে স্তম্ভিত হতে হত। এতদ্ভিন্ন ইংরাজি প্রবন্ধাদি লেখা, বক্তৃতাদি অভ্যাস করা, এ সকলের প্রতিও তিনি মনোযোগ দিতেন। যাতে আমাদের ইংরাজি ভাল বলবার ক্ষমতা জন্মে সেই উদ্দেশে তিনি আমাদের জন্য এক বক্তৃতা-সমিতি স্থাপন করেছিলেন; প্রতি সপ্তাহে তার অধিবেশন হত এবং পৃথিবীর প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনা—নেপোলিয়ন প্রভৃতি মহা মহা বীরদের বীরত্ব-কাহিনী অবলম্বন করে আমরা বড় বড় তর্কবাগীশ একত্র হয়ে বাগ্মিতা ফলাবার চেষ্টা করতুম। সর্বশেষে সভাপতি মহাশয় আমাদের তর্কবিতর্কের সুন্দর মীমাংসা করে দিতেন। এই সভার কার্য অনেক দিন বেশ নিয়মপূর্বক চলেছিল। মাষ্টারমশায়ের প্রতি আমাদের প্রগাঢ় ভক্তি ভালবাসা ছিল তিনিও পিতার ন্যায় আমাদের সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনে যত্নবান ছিলেন। তাঁরি শিক্ষাগুণে আমি ঐ সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের কোন এক সভায় "প্রাচীন ভারতের রণনীতি" বিষয়ক একটি ইংরাজি প্রবন্ধ পাঠ করি—কেশবচন্দ্র সেন সেই অধিবেশনে একজন প্রধান বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন।

সাত বৎসর বয়সে আমি হিন্দু স্কুলে ভর্তি হই, তখন তার নাম ছিল 'হিন্দু কলেজ।' প্রথম দুই বৎসর একাদিক্রমে দুইটি প্রাইজ পাই—দ্বিতীয়খানি সচিত্র Robinson Crusoe—বালকের পক্ষে এমন সুপাঠ্য পুস্তক আছে কি না সন্দেহ। দুবৎসর পরে বনমালী বাবুর ক্লাসে উঠি। তিনি একজন অতি কঠোর প্রকৃতির মাষ্টার ছিলেন। ছেলেদের উপর বড়ই উৎপীড়ন করতেন, সব চেয়ে যে সুশীল বালক সেও তাঁর প্রচণ্ড চটোপঘাত এড়াতে পারত না। বন্ধুবর তারকনাথ পালিত তাঁর চপেটাঘাতে একবার ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন। আমরা তাঁকে যমের ন্যায় ভয় করে চলতুম—যমদূতের মত তাঁর সেই ভীষণ কৃষ্ণমূর্তি মনে করলে এখনো ভয় হয়।

তারকনাথ পালিত

বনমালী বাবুর ক্লাসে আমার পড়াশুনা কেমন হত মনে নাই কিন্তু একটি জিনিসের জন্য সে বৎসরটি আমার চিরস্মরণীয় থাকবে—সে কি না বন্ধুলাভ! আমার সহাধ্যায়ী শিক্ষার্থীদের মধ্যে আমি যে একটি বন্ধুরত্ন পেয়েছিলুম তিনি আমার চিরজীবনের সঙ্গী হয়ে রইলেন। ছেলেবেলায় তিনি আমাকে কত ভালবাসতেন, আমাকে ভাল ভাল পায়রা—লক্কা মুক্ষী লোটন গলাফোলা এনে দিয়ে কত রকমে আমাকে সুখী করবার চেষ্টা করতেন, স্কুলে ও বাড়ীতে সর্বদাই আমরা মাণিক জোড়ের মত এক সঙ্গে থাকতুম। আমার ছেলেবেলাতেই একবার এমন বাত হয়েছিল যে, চলতে কষ্ট হত—তখন তাঁর কাঁধে ভর দিয়ে দিয়ে চলতুম। বড় হয়ে যখন তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লুম তখনো আমরা বন্ধুত্বসূত্রে বাঁধা। আমি বিলাত যাই ১৮৬০ খৃষ্ঠাব্দে, বয়স তখন ১৯; বিলাত থাকতে আমাদের পত্র ব্যবহারে কোনদিন ত্রুটি হয়নি। যখন আমি বোম্বায়ে কাজ আরম্ভ করি তখনও তারক বিলাত যাননি। তিনি বিলাত—থেকে ফিরে আসার বছর দুই পরে—১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে। ব্যারিষ্টার হয়ে দেশে ফিরে আসতে আসতেই প্রায় তিনি ব্যারিষ্টারীতে প্রতিপত্তি লাভ করেন। আমি যখন বিদেশে কর্মস্থলে তখন তিনি এখানে থেকে আমাদের বিষয়-কর্ম সংক্রান্ত সকল বিষয়ে পরামর্শদাতা ও সর্বতোভাবে হিতচিন্তক ছিলেন। আমাদের পরিবারের সবাইকে আপনার মত করেই দেখতেন। তাঁর ভালবাসার চিহ্নসকল আমার জীবনময় ছড়ানো রয়েছে আর তাঁর কাছ থেকে সময়ে অসময়ে যে সকল উপকার পেয়েছি তার জন্য আমি তাঁর নিকটে চিরঋণী। আমার জীবনের উপর দিয়ে কতশত ঘটনা গিয়েছে, অবস্থার কত পরিবর্তন হয়েছে, কত লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় বন্ধুতা হয়েছে

যাঁদের নাম স্মৃতি মাত্রই রয়ে গিয়েছে কিন্তু এই যে বন্ধুতার কথা বলছি এ এখনো পর্যন্ত অক্ষুন্ন রয়েছে।

আমি যাঁর কথাগুলি এই লিখছি আমার সেই প্রিয়সুহৃৎ এ সময়ে রোগশয্যায় শয়ান। ৫, ৬ বৎসর ধরে তিনি উৎকট পীড়ার কষ্ট পাচ্ছেন কিন্তু পীড়ার যন্ত্রণায় তাঁর স্বাভাবিক স্ফূর্তি কখনো ম্লান হতে দেখিনি। কোন দিন একটু ভাল কোন দিন মন্দ, এই উত্থান-পতনের মধ্যে তিনি ধীরভাবে দিনযাপন করছেন। এই দুঃখ কষ্টে তাঁর ধৈর্য অসীম, তাঁর বীর্য ও সাহসের হ্রাস নাই। তাঁর কি রোগ, চিকিৎসায় কি কি প্রয়োজন, তিনি এ সকলি তন্ন তন্ন করে জেনেছেন আর ডাক্তারেরা ঔষধ পথ্য যা কিছু ব্যবস্থা করেন, যাতে তার তিলমাত্র ব্যতিক্রম না হয় তিনি নিজেই তার তত্ত্বাবধান করেন। বলতে গেলে তিনি আপনিই আপনার চিকিৎসক, আপনি ধাত্রী। আমার একজন ইংলণ্ডপ্রবাসী বন্ধু এদেশে এসে তাঁর এই অবস্থা দেখে বলছিলেন, "তারক যেন যমের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন",—সত্যই করছেন—যমের সঙ্গে যুদ্ধ করেই তিনি এতদিন পর্যন্ত জীবিত রয়েছেন।

ডাক্তার Lukis বলতেন, "পালিত কেবল তাঁর Will-power-এর জোরে বেঁচে আছেন—আমাদের ডাক্তারি শাস্ত্রের সবই যেন উল্‌টে দিয়েছেন।"

মৃত্যু আসুক তাতে তাঁর কোন ভয় নাই, কেবল ভয় এই যে, যে মহৎকার্য সমাধা করতে তিনি উৎসুক, পাছে মৃত্যুতে সে কাজের কোন ব্যাঘাত হয়। তিনি তাঁর স্বোপার্জিত প্রভূত ঐশ্বর্য দেশের কল্যাণব্রতে উৎসর্গ করেছেন, তা কারো অবিদিত নাই। আমাদের দেশে যাতে বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রচার হয়, বিজ্ঞান্ বলে যাতে কৃষিশিল্পের উন্নতি এবং ঐ সঙ্গে দেশীয় লোকের অর্থোপার্জনের সহস্র দ্বার উন্মুক্ত হয়, এই তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা। তিনি প্রথমে তাঁর ধনবল একত্র করে জাতীয় শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সহায়তা করেন, পরে যখন সেই বিদ্যালয়ের

ব্যবস্থা তাঁর মনঃপূত হল না, তার স্থায়িত্বের প্রতি সন্দিহান হলেন তখন সেখানকার দান উঠিয়ে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-কলেজ সংস্থাপন উদ্দেশে নূতন দান ব্যবস্থা করলেন—সামান্য দান নয় স্থাবর সম্পত্তি মিলে সাড়ে সাত লাখ টাকারও উপর। দানপত্রের ব্যবস্থা দু কথায় এই যে, প্রস্তাবিত বিজ্ঞান-কলেজে—পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা এই দুই বিদ্যায় দুইটি আসন প্রতিষ্ঠিত হবে—এই প্রথম। দ্বিতীয়, ইহাও বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য যে এই শিক্ষাকার্যে দেশীয় লোকেরাই অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হবেন। যদি তাঁদের যোগ্যতা অর্জনের নিমিত্ত বিদেশে শিক্ষালাভ করা আবশ্যক হয় তাহলে এই ব্যবস্থা-পত্রের কর্তৃপক্ষদের বিবেচনায় যাহা ধার্য হয় সেইরূপ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হবে। কিছুদিন পূর্বে এই নিয়মগুলি লিপিবদ্ধ ও দানপত্র গঠিত করে বিশ্ববিদ্যালয়ে সমর্পিত হয়েছিল। সম্প্রতি আবার প্রায় আরও আট লক্ষ টাকার বিষয় তিনি লেখাপড়া করে সেনেটের হাতে সমর্পণ করেছেন। এই শুভ কার্য সুসম্পন্ন করে এখন তিনি নিরুদ্বিগ্ন মনে তাঁর শেষ দিন প্রতীক্ষা করে রয়েছেন, ভৃত্য যেমন মাসের শেষে আপনার বেতন প্রতীক্ষা করে থাকে—"কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দ্দেশং ভৃতকো যথা।"

এই বিরাট দান উপলক্ষে য়ুনিবারসিটির Vice-Chancellor মহোদয় বলেছেনঃ—"প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, গুরুপ্রসন্ন ঘোষ, দ্বারবঙ্গাধিরাজ প্রভৃতি মহাত্মাগণ বিশ্ববিদ্যালয়ে লাখো লাখো টাকা দান করিয়া আমাদের গৌরবের পাত্র হইয়াছেন সত্য কিন্তু তারকনাথ পালিত মহাশয় তাঁর দুই অসামান্য বদান্যতাগুণে আর সকলকে পরাস্ত করিয়া এই দাতৃমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় হইয়া রহিলেন।"

ছেলেবেলা থেকেই তারকনাথ পালিত তেজস্বী, এইখানে তাঁর বাল্যকালের তেজস্বিতার একটি পরিচয় প্রদান করি। আমরা দুই বন্ধু প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে মেডিকেল কলেজে কেমেষ্ট্রীর লেকচার

শুনতে যেতুম। একদিন প্রফেসার আসার আগে আমরা দুজনে একটু চেঁচিয়ে কথা বলছিলুম। মেডিকেল কলেজের একজন ফিরিঙ্গীর বাচ্ছা তাইতে রূঢ়স্বরে বল্লে—"This is not a Bazar, Don't make such a row"—তারক তাই শুনে ভারী রেগে উঠলেন আর বেশ দুকথা শুনিয়েও দিলেন। তখনই প্রফেসার আসায় তখনকার মত বিবাদটা ঐখানেই থেমে গেল, কিন্তু লেকচার হয়ে যাবার পর ৫।৬ জন ফিরিঙ্গীপুঙ্গব দল বেঁধে তাঁকে আক্রমণ করতে এল, তিনি তাতে ভয় না পেয়ে দেওয়ালের দিকে পিঠ করে দলপতিকে এক ঘুসি বসিয়ে দিলেন। তখন চেলাগণ হাঁ হাঁ করে তাঁর উপর এসে পড়লো, ৪।৫ জনে মিলে তাঁকে কিল চড় বর্ষণ করতে লাগলো। কিন্তু আমার বন্ধুটি ত কিছুতে দমবার পাত্র নন, তাহলে তিনি আজ দেশপূজ্য তারকনাথ পালিত হতে পারতেন না। তিনি দুই হাতে শত হস্তের বল ধরে তাদের উপর ঘুসি চড় কিল বর্ষণ করতে ছাড়লেন না। খুব মার খেলেন সত্য—কিন্তু মারতেও কিছু-মাত্র কসুর করেন নি। আসলে যে তাঁরই জয়লাভ হল একথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করতে হবে। কিন্তু তার পরদিন আমাদের প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রেরা এই খবরে ভারী রেগে গেল। রমানাথ নন্দী বলে একজন ছোকরা আমাদের দলের চাঁই হয়ে দাঁড়িয়ে Awake, arise or be for ever fallen—এই লাইনটা কাগজে লিখে সকলকে উত্তেজিত করতে লাগলো। পর দিন দল বেঁধে মারামারি করতে যাওয়া ঠিক হয়ে গেল। তারক প্রথমটা এতে অমত করলেন, বল্লেন, কার্যক্ষেত্রে তারাও মেরেছে আমিও মেরেছি, শোধবোধ হয়ে গেছে—আবার সেজেগুজে মারামারি করতে যাওয়াটা ঠিক হবে না। কিন্তু সকলে যখন স্থির করলে যে, না, মারতেই হবে, তখন তিনিও আগুয়ান হয়ে দাঁড়ালেন। তার পর যখন দেখা গেল ফিরিঙ্গি অনেক তখন সর্বাগ্রে আমাদের উত্তেজক মহাশয় রণে ভঙ্গ দিলেন; অনেকেই তার অনুসরণ করলে, আমরা যে দুতিন জন শেষ পর্যন্ত অটল

ছিলুম তার মধ্যে ভৈরব বাঁড়ুয্যে একজন। তিনি আমাদের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। আসলে হার হল আমাদের এই দ্বিতীয় দিনে, এদিন তারক খুবই মার খেয়েছিলেন। তবুও ফিরিঙ্গীরা তাঁকে apology করাতে পারেনি। তাদের এ প্রস্তাবে তিনি বলেছিলেন, "আমি মরে যাব তবু apology করব না।"

প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল তখন ছিলেন সাট্‌ক্লিফ সাহেব, তিনি আমাদের খুব ভালবাসতেন। মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ইটুয়েল তাঁকে লিখে পাঠালেন যে, আমরা দল বেঁধে মেডিকেল কলেজের ছোকরাদের মারতে গিয়েছিলুম। প্রিন্সিপ্যালের কৈফিয়ৎ তলবে তারক তখন সমস্ত খুলে বল্লেন। সেই ফিরিঙ্গী কি রকম রূঢ় ব্যবহার করেছিল—যা থেকে এই মারামারির উৎপত্তি—একলা তাঁকে তারা ৪।৫ জন মিলে কি রকম আক্রমণ করেছিল—সব শুনে সাট্‌ক্লিফ সাহেব নেপথ্যে বল্লেন—Served him right—; যাহোক প্রকাশ্যে দুজনেরই জরিমানা হয়ে মামলা মিটমাট হয়ে গেল।

আর কয়েক বৎসর পরে হিন্দু স্কুল থেকে কিছুকালের জন্যে St. Pauls' School-এ গিয়ে ভর্তি হই। সেখানে ইংরাজ ফিরিঙ্গী আরমানী ছেলেরা আমার সহাধ্যায়ী ছিল; তাদের সঙ্গে যে, সকল সময়ে মিলে মিশে সদ্ভাবে থাকতুম তা বলতে পারি না, কখন কখন টকরাটকরি ঘুসোঘুসিও হত। ঐই রকম একটা দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথা আমার মনে আছে। একটি ছেলের সঙ্গে আমার হাতাহাতি ব্যাপারের কথা আমাদের Rector-এর কানে গিয়েছিল। কার দোষ সে বিষয় অনুসন্ধান না করেই বোধ করি আমাকেই প্রথমটা তিনি দোষী বলে সাব্যস্ত করে থাকবেন। কেননা আমাদের কিছু আগে একটা পরীক্ষা হয়ে গিয়েছিল তাতে আমার যে প্রাইজ পাবার কথা ছিল তা বন্ধ করবেন বলে শাসিয়েছিলেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমার সেরূপ কোন শাস্তি হয় নাই। আমি ইংরেজি সাহিত্যে বেশ ভাল রকমই পরীক্ষা দিয়েছিলুম। Goldsmith-এর একটি সেট বই তাতে

প্রাইজ পাই। আমার ক্লাসের ছেলেদের সন্তুষ্ট করবার এক সহজ উপায় ছিল—তাদের মসলা বিতরণ করা। আমার পকেটে সুপারি এলাচ লবঙ্গ প্রভৃতি মসলা থাকত, তাই খেতে তারা খুব ভালবাসত, কাজেই আমার সঙ্গে তাদের ভাব রাখতে হত। মাষ্টারেরা আমাকে ভালবাসতেন—Pridham সাহেব আমাকে বড় অনুগ্রহ করতেন—তাঁর ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাকে ছবি দেখাতেন আর তিনি নিজে যখন ছবি আঁকতেন তখন আমি বসে বসে দেখতুম। অন্যান্য ছেলেদের মত মাষ্টারদের কাছ থেকে আমাকে বেত্রাঘাত সইতে হত না। এক একটা মাষ্টার ভয়ানক গোঁয়ার ছিল—ছেলেরা তাঁর বেত্রাঘাতের ভয়ে সর্বদাই সশঙ্কিত থাকত। আর দুই একটি ছেলের প্রতি তাঁর বিশেষ ক্রোধকটাক্ষ দেখতুম, তাদের প্রতি অকারণ অত্যাচার দেখে আমার ভারি কষ্ট হত। বেচারাদের পিঠের চামড়া বোধ করি কোনখানে অক্ষত ছিল না।

সেণ্টপল ছেড়ে পুনর্বার হিন্দু স্কুল। সেখান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করি।

রামচন্দ্র মিত্র

কলেজ আমাদের যে সব শিক্ষক ছিলেন তাঁদের মধ্যে রামচন্দ্র মিত্র উল্লেখযোগ্য। তাঁর কাছে আমরা শ্যামাচরণ সরকারের বাঙ্গলা ব্যাকরণ ও অন্যান্য বাঙ্গলা বই পড়তুম। তাঁর সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবাদ আছে; অনেকগুলি অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনাও আমাদের স্বচক্ষে দেখা;—তাঁর চেহারা ধরণ ধারণ সকলি কৌতুকাবহ। কোন বড় লোকের সঙ্গে আলাপ করতে হলে পায়ে পা ঠেকিয়ে 'I beg your pardon' বলে ক্ষমা প্রার্থনা করা হত; সেই আলাপের সূত্রপাত। ক্লাসের ছেলেরা দুষ্টুমি করে অনেক সময় তাঁকে জ্বালাতন করত কিন্তু কোন্ ছেলের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করতে হবে—কোথায় নরম কোথায় বা গরম—তা তাঁর পাকা জানা ছিল। পাড়াগেঁয়ে ছেলেদের উপর তাঁর ভারি আক্রোশ, কেননা তিনি বেশ জানতেন তারা মুখের উপর কোন জবাব করতে সাহসী হবে না। অথচ অন্য অবাধ্য দুষ্টু ছেলে যাদের এক কথা বললে মুখের উপর দুকথা শুনিয়ে দেবে তাদের প্রতি অতি নম্র ব্যবহার। 'শক্তের ভক্ত নরমের গরম' তাঁর সম্বন্ধে অবিকল খাটত।

একদিন আমাদের ক্লাসের একজন পাড়াগেঁয়ে ছেলে পাঠ্য বই আনেনি এই নিয়ে তিনি তার প্রতি মহা খাপ্পা হয়ে কটুবাক্য বর্ষণ করেছেন দেখে তারক বল্লেন, "ওকে ও রকম গালাগালি দিচ্ছেন কেন? ও কি করেছে? জানেন আমরা ফাস্ট ইয়ার ক্লাসে পড়ি।"

তখনই তিনি নরম হয়ে অতি মৃদুস্বরে বল্লেন—"ও বই আনেনি তাই শাসন করলুম।" তারক উত্তরে বল্লেন "আমিও তো বই আনিনি আমাকেও কি ঐ রকম করে শাসন করবেন।" রাম মিত্র

বল্লেন (মৃদুমন্দভাবে) "ওঃ তুমি বই আননি—তা পাশের ছোকরার বই দেখে পড়।"

ছেলেরা যখন ভারি গোল করছে কিছুতেই বাগ মানে না তখন তিনি তাদের থামাবার একটি বিচিত্র উপায় অবলম্বন করতেন। নানা রকম মুখভঙ্গী করে কেদারা থেকে উঠে বোর্ডে খড়িতে বড় বড় অক্ষরে লিখতেন Silence! Silence! Silence! চুপ চুপ চুপ! তার পর চৌকিতে বসে বলতেন, "এখন কে গোল করবে করুক দেখি!"

আমরা বিদ্যাশিক্ষার প্রণালী অনেক রকম শুনতে পাই, ওবিষয়ে নানা মুনির নানা মত—কিন্তু রামমিত্রের শিক্ষাপ্রণালী সম্পূর্ণ নূতন, আর কারো সঙ্গে তার তুলনা হয় না। দু-একটি নমুনা দিচ্ছি :—

পৃথিবী গোল কি করে মনে রাখতে হয়? রসগোল্লা খেতে খেতে তার গোলাকার ধ্যান করা।

ভূগোল শেখার সহজ উপায় কি? স্টুয়ার্টের জিওগ্রাফিখানি ২০ আনা মুখস্থ করা—লেখার সময় চার আনা ভুলে গেলেও—১৬ আনা মনে থাকবে।

Composition ভাল লিখতে হয় কি করে? ভাল ভাষায় প্রকৃতি বর্ণনা করিতে গেলে সুশীতল সমীরণ এই দুটি কথা লিখতে হবে। তবে যেখানে সাধুভাষা মনে না আসে সেখানে 'ঠাণ্ডা বাতাস' বসিয়ে দেবে। কলসের স-টা কোন্ স যদি মনে না থাকে তাহলে সেখানে 'ঘট' শব্দটা ব্যবহার করলেই ল্যাটা চুকে যাবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

একবার পরীক্ষা দেবার সময় কোন ছাত্র তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল—মশায় এই বইটার কোন্ কোন্ অংশ ভাল করে দেখে রাখা চাই, আমাকে বলে দিন!

উত্তর—(খানিকক্ষণ চিন্তা করিয়া)

Mark the first page! Mark the second page!!

বলতে বলতে বইটার কোন ভাগই বাদ গেল না, সে বেচারা 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' বলে প্রস্থান করলে।

রামমিত্রের নামে অনেক গল্প আছে, আর কত বলব। কেশবচন্দ্র তাঁর নকল করতে বিলক্ষণ পটু ছিলেন। কেশরবাবু রামমিত্রের সম্বন্ধে একটি গল্প বলতেন, সেটি হচ্ছে এই ঃ—

একদিন রামমিত্র ছেলেদের বটানিকাল গার্ডেনে বেড়াতে নিয়ে গেছেন। বাগানের মধ্যে যে একটা গাছের ঘর আছে সেইখানে তাঁর দলবল নিয়ে তিনি যেমন প্রবেশ করেছেন—অমনি সেখানে উপস্থিত একটা রুক্ষ মেজাজের ইংরাজ রেগে তাঁকে সম্ভাষণ করলে—

"Who the devil are you ?"

তিনি ভীত হয়ে বল্লেন—

"Professor Ramchandra Mitra, Professor Presidency College."

উত্তর হল—D—your Professor' তখন তিনি ছেলেদের নিয়ে বাইরে এসে হাঁপ ছেড়ে বল্লেন—

Let us forget and forgive, let us exercise the Christian virtue of forgiveness.

আমরা সকলে একবার সিংহলে ব্যাড়াতে গিয়েছিলুম। স্টীমারে আমাদের সঙ্গে ছিলেন কেশববাবু আর কালিকলম গাঙ্গুলী বলে একটি আমুদে মজলিসী লোক,—'কোলাই কোমল গাম্বলাই' বলে আপনার পরিচয় দিতেন। সমুদ্রের উপরে রামমিত্রের গল্প আমাদের এক প্রধান খোরাক ছিল। সে সব কথা শুনে হাসতে হাসতে আমাদের নাড়ী ছিঁড়ে যেত।

'কোলাই কোমল' শেষে আমাদের ভারি মুস্কিলে ফেলেছিলেন।

দেশে ফেরবার সময় তিনি কি একটা কাজের ছুতো করে বোটে উঠে ডাঙ্গায় নেমে গেলেন। এই আসছি বলে কোথায় যে অন্তর্ধান হলেন তার আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। তাঁকে ছেড়ে স্টীমার চলে গেল। তার দু-এক সপ্তাহ পরে তবে কলকাতায় আবার তাঁর দেখা পাই।

বিলাত যাত্রা

প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আমার বিলাত যাত্রা। আমি কখনও স্বপ্নেও যা ভাবি নাই আমার ভাগ্যে তাই ঘটল। আমাদের জীবনে পদে পদে দেখা যায়—দৈবের কি বিচিত্র গতি! এক একটা অদৃষ্ট-পূর্ব আকস্মিক ঘটনা এসে কত সময় আমাদের জীবনস্রোতকে কোন্ এক অজ্ঞাত নূতন পথে যেন বলপূর্বক টেনে নিয়ে যায়—যার পূর্বাভাস কিছুই পাওয়া যায় নাই। আমার জীবনে এ কথা সপ্রমাণ দেখতে পাই। আমি বাল্যকালে একভাবে শিক্ষিত হচ্ছিলুম, আমার জীবন একভাবে গঠিত ও নিয়মিত হচ্ছিল, দৈবঘটনায় কোন এক বন্ধুমিলনে সে সমস্তই উল্টে গেল, আমার জীবন-প্রবাহ অন্য দিকে বিবর্তিত হল। সেই বন্ধুর মন্ত্রণায় আমার বিদেশযাত্রা, ইংলণ্ডে গিয়ে সিবিল সর্বিসের পরীক্ষা দেওয়া ইত্যাদি কারণে আমার পূর্ব-নির্দিষ্ট জীবনের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটল।

বাল্যকাল হতে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে আমার জীবন-সূত্র গ্রথিত ছিল। কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত আমাদের এই সমাজ এমন মৃদু মন্দ গতিতে চলছিল যে, তার প্রভাব বিশেষ অনুভব করতে পারিনি। আমার পিতা সিমলা পাহাড় থেকে ফিরে আসবার পর এমন এক ঘটনা উপস্থিত হল যাতে সেই সমাজের ইতিহাসে এক নূতন পৃষ্ঠা উদ্‌ঘাটিত হল। সেই ঘটনা হচ্ছে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মিলন। কেশবের আগমনে আমাদের সমাজে নবজীবনের সঞ্চার হল। তিনি কোন্ সূত্রে প্রথমে আমাদের এই দলে প্রবেশ করলেন তা আমার বেশ মনে পড়ে। তিনি প্রথমে আমার সঙ্গে এসে সাক্ষাৎ করেন—আমি তাঁকে আমার পিতার নিকট নিয়ে যাই। তিনি আপনাদের কুলাচার অনুসারে গুরুমন্ত্র গ্রহণ করবেন কিনা এই বিষয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল। পিতার সহিত

তিনি এ বিষয় পরামর্শ করতে আসেন। পরামর্শে স্থির হল যে এই মন্ত্রে যখন তাঁর বিশ্বাস নাই তখন তাহা গ্রহণ করা যুক্তিসিদ্ধ নয়। মন্ত্র গ্রহণ না করাই তিনি স্থির করলেন। সেই অবধি তাঁর উপর তাঁর বাড়ীর লোকদের অত্যাচার আরম্ভ হল পরিশেষে তিনি সব ছেড়েছুড়ে সস্ত্রীক আমাদের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করলেন—পিতাও তাঁকে স্নেহপূর্বক আপনার পুত্ররূপে বরণ করে নিলেন। সেই সময় থেকে কেশবচন্দ্র ও তাঁর পত্নী আমাদের পরিবারভুক্ত হয়ে আমাদের বাড়ীতে কিছুকাল বাস করেন। ব্রাহ্মসমাজের সেই মধ্যাহ্নকাল ;—কেশবের প্রভাবে সমাজ এক নূতন মূর্তি ধারণ করলে। আমিও সেই উৎসাহ-তরঙ্গে গা ঢেলে দিলুম। ব্রাহ্মসমাজের বেদী হতে পিতার হৃদয়ভেদী প্রার্থনা ও উপদেশ; আর আমাদের রচিত নব নব ব্রহ্ম-সঙ্গীত মিলে সমাজে সাপ্তাহিক উপাসনার মধ্যে এক নূতন শ্রী, নূতন প্রাণ সঞ্চারিত হল। আমি এই সব নিয়ে মেতে আছি এমন সময় মনোমোহন ঘোষ আমাদের বাড়ী অতিথি হয়ে থাকতে এলেন। যেন একটা বোমা আকাশ থেকে পড়ে সব ভেঙ্গে চুরে দিয়ে গেল।

মনোমোহন ঘোষ

মনোমোহনের সঙ্গে আমাদের পৈতৃক সম্বন্ধ। তাঁর পিতা রামলোচন ঘোষ আমার পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুরের পরম বন্ধু ছিলেন, ঐ বন্ধুতা সূত্রে মনোমোহনের সঙ্গে আমারও বন্ধুতা জন্মেছিল। একজন ইংরাজ মাষ্টার আমাদের পড়াতে আসতেন, তিনি মনোমোহনের সম্বন্ধে বলতেন, "An old head on young shoulders"—যুবার ধড়ে বুড়ার মাথা। বাস্তবিকই তাই। তিনি আমার চেয়ে কিছু ছোট ছিলেন, তাঁর বয়স তখন ১৭ হবে অথচ Indian Mirror সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদকীয় ভার তিনি অকাতরে স্কন্ধে নিলেন। ঐ বয়সে তাঁর মাথায় Civil Service পরীক্ষার কল্পনা খেলছিল। দুঃখের বিষয় এই যে তাঁর মনের সাধ পূর্ণ হল না। তিনি ভেবেছিলেন এক বলবত্তর দৈব তাঁকে অন্য দিকে নিয়ে গেল। আমার জীবনক্ষেত্র বোম্বাই, তাঁর হল বাঙ্গলা দেশ; আমার কর্ম গবর্ণমেণ্টের চাকরী, তাঁর স্বাধীন আইন ব্যবসা; তিনি যে ক্ষেত্রে জয়লাভ করলেন সেই তাঁর উপযুক্ত ক্ষেত্র, আমিও আমার উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র পেলুম। কেবল দুঃখ রইল আমাদের একযাত্রায় পৃথক ফললাভ ঘটল।

আমাদের বিলাত যাওয়া একরকম ঠিক হয়েছে এমন সময় আমরা একদিন Botanical Garden-এ বেড়াতে যাই। পার হবার সময় একটা ষ্টিমারের ধাক্কায় আমাদের নৌকা উল্টে গেল। আমি সাঁতার জানতুম, নৌকার একভাগ কোনরকম করে আঁকড়ে ধরে রইলুম কিন্তু মনোমোহন নৌকার তলায় পড়ে হাবুডুবু খেতে লাগলেন তাঁর আর উদ্ধারের কোন উপায় ছিল না। শেষে অনেক ডাকাডাকির পর এক পানসীর মাঝি তাঁকে টেনে ওঠালে। আমারা কাউকে কিছু না বলে সেই ভিজে কাপড়ে আমাদের গম্য স্থানে চলে গেলুম—

সেখানে কাপড় শুকিয়ে বেড়িয়ে চেড়িয়ে যথা সময়ে বাড়ী ফিরলুম। এই বৃত্তান্ত বাবামশায়ের কর্ণগোচর হওয়াতে আমাদের বিলাত যাওয়া বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল। তিনি বল্লেন, "তোমরা এখানেই আপনাদের আপনারা সামলাতে পার না তোমাদের ঐ দূরদেশে পাঠান যায় কি করে? তোমাদের কেউ সঙ্গী নেই, রক্ষক নেই, আপনার উপরে নির্ভর করেই যেতে হবে, তোমরা তা পেরে উঠবে কিনা এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে।" বাস্তবিক ভেবে দেখতে গেলে আমরা অসমসাহসের কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম বলতে হবে। আমরা দুটি তরুণবয়স্ক বালক আর তখন ইংলণ্ডে যাওয়া এখনকার মত এপাড়া ওপাড়া নয়। Suez Canal তখন প্রস্তুত হয় নাই, Suez থেকে Alexandria পর্যন্ত রেলপথ। এই পথের সমুদায় বিঘ্নবাধা অতিক্রম করে যাওয়া আমাদের মত বালকের পক্ষে সহজ ছিল না। তখনকার কালে লোকে 'কালাপানি' পার হওয়া এক অসাধ্যসাধন মনে করত—অকারণে নহে; কেননা আমাদের মধ্যে প্রথম যে দুইজন যাত্রী যান, রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর, তাঁদের আর দেশে ফিরে আসতে হয় নাই। কাজেই লোকেদের ধারণা ছিল যে ও দেশে গেলে আর ফিরতে হবে না—

"The land from whose bourne
no traveller returns"

যা হোক্ শেষে আমাদের যাওয়াই সাব্যস্ত হল। আমি ত আমার প্রিয়জনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অকূল পাথারে ভেসে পড়লুম। আমার সে সময়কার একটি বিদায়ের গান এই—

কেমনে বিদায় লব থাকিতে জীবন
কোন প্রাণে চলে যাব বিজন গহন।
কেমনে ছাড়িব তারে, সদা প্রাণ চাহে যারে,
কেমনে সহিব বল বিচ্ছেদ দহন॥

শরীর যদিও যাবে, মন সদা হেথা রবে,
যার ধন তারি কাছে রবে অনুক্ষণ।
দিবস ফুরায় যত, ছায়া যায় দূরে তত,
কভু না ছাড়য়ে তবু পাদপ-বন্ধন ॥

আমার পথের সমুদায় বিঘ্নবাধা অতিক্রম করে ভালয় ভালয় আমাদের গম্যস্থানে গিয়ে পৌঁছলুম, আমাদের জাহাজ Southampton বন্দরে নোঙর করবামাত্র আমার আত্মীয় জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর* আমাদের নিতে এলেন। আমরা তাঁর সঙ্গে লণ্ডনে গিয়ে তাঁর বাড়ীতে উঠলুম। তাঁর স্ত্রী কমলা ও দুই কন্যা আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করে ডেকে নিলেন। তাঁদের অতিথি হয়ে কিছুকাল সুখে কাটান গেল। তাঁদের বাড়ী খৃষ্টমিসনরিদের এক আড্ডা ছিল, তা ছাড়া সেখানকার অন্যান্য লোকদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করবার সুবিধা পেলুম। সেখান Hodgson Pratt নামক ভারত-হিতৈষী মহাত্মার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হল, তিনি অভিভাবকের ন্যায় আমাদের অত্যন্ত যত্ন করতেন। তাঁরই পরামর্শে আমরা মাসকতক পরে Windsor-এর নিকটবর্তী একটি পল্লীতে এক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ পরিবারের মধ্যে বাস করে আমাদের পরীক্ষার উপযোগী পাঠাভ্যাসে নিযুক্ত রইলাম। গৃহটি ছাত্রাবাস ধরণের স্থান, আমরা ছাড়া আরো কয়েকজন ছাত্র ছিল। যিনি গৃহস্বামী তিনি আমাদের ইংরাজী শিক্ষক; সংস্কৃত, আরব্য, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি অন্য বিষয়ের জন্য অন্যান্য শিক্ষক নিযুক্ত ছিল। Dr. G. একজন রুক্ষ প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাঁর স্ত্রীও সেইরূপ মুখরা। বুড় বুড়ীর মধ্যে যে খুব বনিবনাও ছিল তা নয়, মাঝে মাঝে প্রায়ই খিটিখিটি চলত। তাঁদের কন্যারত্ন—একটি প্রাপ্তবয়স্কা কুমারী গৃহের শ্রীস্বরূপা ছিলেন, তিনি অনেক পরিমাণে এই অশান্তির প্রতিবিধান করতেন। আমাদের পড়ার মাঝে যা কিছু সময় থাকত তাঁরই সংসর্গে কাটাতুম।

* ইনিই প্রথম বাঙ্গালী ব্যারিস্টার, অনেকে হয়ত তা জানেন না!

কাছে একটি ছোট্ট নদী ছিল, তাতে আমরা কেহ কেহ বোটে করে ব্যাড়াতে বেরতুম। মনে আছে একবার আমি কৌতুকক্রমে তাঁর মনে ভারি আঘাত দিয়েছিলুম। তিনি আমাকে একটি ফুল উপহার দেন—সযত্নে আমার বুকের উপর কোটে পরিয়ে দিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ফুলটি শীঘ্র শুকিয়ে গেল। কে একজন জিজ্ঞাসা করলেন—"এর মধ্যে ফুল শুকিয়ে গেল—এর কারণ কি ?" আমি উত্তর দিলুম, 'ভিতর থেকে রস পায়নি বলে বেচারা অত শীঘ্র মুষড়ে পড়েছে।" Miss G. মনে করলেন আমি তাঁর উপর কটাক্ষ করে এ কথা বল্লুম—যদিও আমি কেবল কথার কথামাত্র বলেছিলুম, কোনই গূঢ় অভিপ্রায় ছিল না। যা হোক্ আমার এই অনবধানের উক্তির দরুণ আমি তাঁর বিরাগভাজন হয়েছিলুম—কত সাধ্য সাধনার পর তাঁর মানভঞ্জন হল। এই ছাত্রাবাসে থেকে পাঠাভাসে আমাদের বিস্তর খাটতে হত; মাঝে মাঝে একটু বিশ্রাম নিয়ে সন্ধ্যা সকাল পর্যন্ত নিয়মিত পরিশ্রম করতে হত; এই অতিরিক্ত পরিশ্রমে যে আমার শরীর ভেঙ্গে পড়েনি এই আশ্চর্য। এই পরিশ্রমের কুফল হওয়া দূরে থাকুক সদ্যই সুফল ফললো। ১৮৬২ সালে আমি সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলুম। যখন পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয় তখন আমি মনোমোহনের সঙ্গে য়ুরোপে ভ্রমণে বেরিয়েছি —প্যারী নগরীতে 'পাস' হওয়ার সংবাদ আমার হাতে এল। আমি 'পাস' মনোমোহন ফেল। আমি প্রথম বৎসরেই পরীক্ষোত্তীর্ণ হতে পারব এরূপ আশা করি নাই। আমার আশাতীত ফল লাভ হল তাতে আমার আনন্দ কিন্তু আমার বন্ধুর নৈরাশ্য সংবাদে সে এক রকম 'হরিষে বিষাদ' বোধ করলুম। সে যাই হোক্ আমাদের মনের কথা মনেই রইল। তখন আমরা ভ্রমণে বেরিয়েছি—আমাদের ব্রত উদ্‌যাপন করা প্রথম কাজ। প্যারী হতে আমার Switzerland-এ প্রবেশ করলুম। 'প্যারী' এই নামের সঙ্গে কি মধুর স্মৃতি জড়িত আছে। নগরটি কি সুন্দর দুই বৃক্ষ শ্রেণীর মধ্য দিয়ে প্রশস্ত পথ

গিয়েছে—(Boulevards), বিপণিগুলি কি সুসজ্জিত কি লোভনীয়৷ প্রাসাদ চিত্রশালা সকলি মনোরম, প্যারীর কি এক সম্মোহন মন্ত্র আছে বিদেশীর মন লণ্ডন অপেক্ষা সহজে আকর্ষণ করে। লণ্ডন এক প্রকাণ্ড ব্যাপার, তার ভিতরে অনেক দেখবার জিনিষ, অনেক শেখবার বিষয় আছে—তার সঙ্গে পরিচয় হওয়া বিস্তর সময়সাপেক্ষ; কিন্তু প্যারীর সৌন্দর্য প্রথম দর্শনেই নয়নমন হরণ করে। প্যারী হতে Swiss-দের দেশে গিয়ে সেখানকার দর্শনীয় প্রধান প্রধান স্থানগুলি দেখে নিলুম। সরোবরের ক্রোড়লীন জেনেবা নগরী; Lausanne যেখানে গিবন তাঁর রোম সাম্রাজ্যের ইতিহাস সমাপন করেন; Chillon দুর্গ যার বন্দী কাহিনী বাইরণের কবিতায় বর্ণিত—রিগির পাহাড় যার উপর থেকে সূর্যের উদয়াস্ত শোভা দেখবার জন্যে যাত্রীরা দলে দলে সমাগত হয়। তখন পাহাড়ের শৃঙ্গ পর্যন্ত রেলগাড়ী প্রস্তুত হয় নাই, পদব্রজে ওঠানামা শ্রান্তিজনক কিন্তু উপরে গিয়ে সূর্যাস্তের চমৎকার শোভা দর্শনের ফলে সকল শ্রান্তি দূর হয়। Switzerland এর পার্বত্য দৃশ্য অতি সুন্দর। গিরি সরোবর সমন্বিত চমৎকার শোভা। সেখানকার পাহাড়গুলি হিমালয়ের মত বিরাট মূর্তি নয়—তারা অভ্রভেদী দেব-আত্মা ভীষণ দর্শন নহে—সে গিরিশ্রী অন্যরূপ যেন আমাদের অপেক্ষাকৃত আয়ত্তের ভিতর—ঘরের জিনিস। ও-দেশের ধবলগিরি হচ্ছে Mont Blanc সেও 'সতত ধবলাকৃতি বিশাল অটল। তার অধিত্যকায় শামুনি গ্রামে আমরা কয়েকদিন বাস করি—সেইগ্রাম হতে পর্বতের তুষারমণ্ডিত গাত্র দিয়ে ওঠানামা করে মনের সাধে বেড়িয়ে বেড়াতুম।

শামুনি হতে সেই গিরিরাজের সম্মুখীন হয়ে কবি কোলরিজের স্তব মনে পড়ত—

"O dread and silent Mont !
I gazed upon thee,

Till thou, still present to the
Bodily sense,
Did'st vanish from my thought
Entranced in prayer,
I worshipped the Invisible alone!"

হে গিরিরাজ, তোমাকে ভুলিয়া সেই অমূর্তের ধ্যানে মগ্ন হইলাম।

শেষে ষ্টিমারে করে Lucerne সরোবরের উপর পরিভ্রমণে পালা সাঙ্গ হল। য়ুরোপের মুক্তক্ষেত্র হতে আবার আমরা ক্ষুদ্র ছাত্রাবাসে প্রত্যাবর্তন করলুম। বাড়ী গিয়ে আমার এই জয়বার্তা ঘোষণা করবার জন্য মন ছটফট করছে কিন্তু এই গেল প্রথম পরীক্ষা, দ্বিতীয় পরীক্ষার জন্য আর এক বৎসর অপেক্ষা করতে হবে। সে বৎসর লণ্ডনে University Hall গৃহে সেই পরীক্ষার উপযোগী পড়াশুনায় সময় কেটে গেল। সেও এক ছাত্রাবাস কিন্তু প্রথমোক্ত পল্লীতে আমরা যে-ভাবে ছিলুম এখানে তা হতে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত। পারিবারিক শৃঙ্খলার অভাব। যিনি আমাদের প্রিন্সিপাল ছিলেন তিনি নির্লিপ্তভাবে দূরে থাকতেন—তাঁর সঙ্গে খাবার টেবিলের যা আমাদের দেখা হত। আমাদের সব নিজের গোছগাছ করে নিতে হত। দু একটি ছাত্রের সঙ্গে আমার খুব হৃদ্যতা হয়েছিল। তাদের মধ্যে এখন কেবল একটির নাম (Schwanne) দেখতে পাই, যিনি এক্ষণে পার্লামেণ্টের মেম্বর। দ্বিতীয় পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে আমার দেশে ফেরবার সময় এল। তখন আমার বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কবির আশর্বাদ সহকারে ভারত অভিমুখে যাত্রা করলুম। মনোমোহন 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন' পণে সে দেশেই পড়ে রইলেন। কবির আশীর্বাদ—

সুরপুরে সশরীরে শূরকুলপতি
অর্জুন, স্বকাজ যথা সাধি পুণ্যবলে

ফিরিলা কাননবাসে ; তুমি হে তেমতি
যাও সুখে ফিরে এবে ভারত মণ্ডলে,
মনোদ্যানে আশালতা তব ফলবতী !
ধন্য ভাগ্য, হে সুভগ, তব ভবতলে !
যাও দ্রুতে, তরি
নীল মণিময় পথ অপথ সাগরে !
অদৃশ্য রক্ষার্থে সঙ্গে যাবেন সুন্দরী
বঙ্গলক্ষ্মী। যাও, কবি আশীর্বাদ করে !*

আমি আগেই বলেছি যে ছেলেবেলায় বাবামশায়ের কাছে আমরা অল্প সময়ই থাকতুম। একালে যেমন পিতাপুত্রে অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে মেলামেশা দেখি, তখনকার কালে তেমনটি ছিল না, ছোটরা বড়দের অত্যন্ত সমীহ করে চলতো। আমাদের যা কিছু আমোদ আহ্লাদ মেলামেশা সে পিতার পারিষদবর্গের সহিত, তাঁদের কাছেই মন খুলে কথা কবার সুযোগ হত।

---

* মাইকেল মধুসূদন দত্ত—চতুর্দশপদী কবিতাবলী।

দেবেন্দ্র সভা

———ন্দ্রসভায় নানা লোকের সমাগম ছিল, তার মধ্যে কতকজন ...ারের লোক। আম-দরবারের যে সব লোক যাওয়া আসা ...াদের কথা পাড়বার আবশ্যক নেই। একমাত্র বলে রাখি যে, এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজে যাঁরা ঘন ঘন যাওয়া আসা করতেন তাঁদের মধ্যে অনেকে ছিলেন সম্ভ্রান্ত স্বর্ণবণিক শ্রেণীর লোক। এখন আর সে দলের লোক দেখতে পাই না—এমন হতে পারে যে, এক্ষণে দেবতার আরাধনায় মগ্ন থেকে তাঁরা আর উচ্চতর সাধনার সময় পান না। যে সকল লোক এক সময়ে দেবেন্দ্রসভার অন্তরঙ্গ ছিলেন তাঁদের দু চারজনের কথা বল্লেই যথেষ্ট হবে।

বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত—ছোট্ট মানুষটি কিন্তু তাঁর ব্যবসাবুদ্ধি তীক্ষ্ণ ছিল। তাঁর মাথায় কতরকম speculation খেলত কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কিছুতেই সাফল্যলাভ করতে পারতেন না। আজ চায়ের ব্যবসা, কাল বই, পরশু কাপড়—তাঁর কথা শুনলে মনে হত এবার বুঝি সোনার কাটি হাতে পেয়েছেন—যাতে ছোঁয়াবেন সোনা ফলবে। শেষে দেখা যেতো কোনটাতেই তাঁর মনোমত ফললাভ হল না।

আর এক ছিলেন রাজা কালীকুমার; জাতিতে স্বর্ণবণিক, হৃষ্ট পুষ্ট, শুচিবাইগ্রস্ত লোক, যিনি সন্দেশ ধুয়ে খেতেন। তিনি পারস্য সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন—তাঁর সহচর একটি মুসলমান যুবক সঙ্গে সঙ্গে ফিরত। তাঁর ফারসী বয়েৎ আওড়ানো মনে পড়ে—একটি স্তোত্র মনে আছে, তা এই:—

তু জান পাক-অয় সর্‌বসর্ বে আব খাক, অয়ি নাজ্‌নি
(তুমি প্রাণ, পবিত্র সর্বশঃ, না আপ মাটি, হে প্রিয়তম)
বল্লা জ্-জাঁ হম্ পাকতর রূহে ফদাক অয়ি নাজ্‌নি
(ও আল্লা প্রাণ হতেও পবিত্রতর আত্মায় লীন হে প্রিয়তম)

তুমি প্রাণ তুমি ওহে পূর্ণ পুণ্যময়,
প্রপঞ্চ অতীত তুমি, ওহে প্রিয়তম।
প্রাণ হতে পুণ্যতর তুমি হে মহেশ,
একাত্মা তুমি ও আমি ওহে প্রিয়তম॥

বড়দাদা রাজার নাম রেখেছিলেন 'সম্ভোগ বিলাস।'

সম্ভোগ বিলাস নামে মাংসের ঢিবি
মধ্যে শিবে নেড়ে আর গুড়গুড়ি জিবী।

নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

নবীনবাবু ছিলেন দেবেন্দ্রসভার বিদূষক। তিনি আমাদের সকলকে নিয়ে খুব হাস্য পরিহাস করতেন। আমাকে ডাকতেন 'পক্ষী' বলে। তিনি কখনো কখনো আমাদের কোন মিষ্টান্নের ভাগ দিয়ে বলতেন—

অর্ধ রুটি যদি খায় ঈশ্বরের জন
তাহার অর্ধেক করে অন্যে বিতরণ।

কত পাগলামী ছড়া আওড়াতেন সব মনে নেই। দু-একটা বলি—

অজসা গরসা

দুই সাপ—এই কালীয়দমনের দুই সর্দার রাম ও শ্যাম—

ধন্য ধন্য রাম শ্যাম তোমাদের কার্য
তোমাদের কার্য সকলের অনিবার্য
যখন তোমরা গিয়া চড় যার ঘাড়ে
অজসা গরসা আদি সবে তারে ছাড়ে।

অজসা গরসা যেন ছাড়ল, এখন রামশ্যামের হাত থেকে রক্ষা করে কে?

সাপ ও বেঙের কথোপকথন

সাপ—"জিহ্বা লিড়ি বিড়ি সিড়ি কিচড়ি মিচড়ি করি কুপ—" (আমি যদি কুপ করে তোকে খেয়ে ফেলি?)

ব্যাঙ—"হম্ যদি পানিমে ডুব গয়া ভুসম ভুসড়ি খায়া গুজড়ি মুজরি করি গুপ—" (আমি যদি গুপ করে জলে ডুবে যাই?)

নবীনবাবু চার রকম ভিন্ন প্রকৃতি লোকের কথা বলতেন—

বেগবেগা, বেগচেরা, চেরবেগা, চেরচেরা,। স্মরণশক্তির তারতম্যে এই চার রকম লোক হয়।

বেগবেগা,—যে শীঘ্র শেখে শীঘ্র ভুলে যায় ;
বেগচেরা,—যে শীঘ্র শেখে চিরদিন মনে রাখে ;
চেরবেগা,—যে দেরীতে শেখে শীঘ্র ভুলে যায় ;
চেরচেরা,—যে দেরীতে শেখে দেরীতে ভোলে।

এর মধ্যে অবশ্য বেগচেরা হওয়াই প্রার্থনীয়। তার নীচে চেরাচেরা। চেরবেগাই অধম।

উপরে নবীনবাবুকে বিদূষকরূপেই চিত্রিত করে দেখান গেল, কেননা তাঁর ঐ দিক্‌টাই আমাদের চোখের সামনে থাকত ; কিন্তু তা ছাড়া আর আর দিকেও তিনি ব্যাখ্যানযোগ্য। সাহিত্য-সমাজে তাঁর প্রতিপত্তি সামান্য ছিল না। কেবল আমাদের ঐ বয়সে তাঁর বিদ্যাসাধ্যের সর্বাঙ্গীণ মর্যাদা আমরা বুঝতে পারতুম না। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত প্রথমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি অবসর নেবার পর নবীনবাবু সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন ও দক্ষতাসহকারে কয়েক বৎসর সেই কার্য সম্পাদন করেন। তত্ত্ব-বোধিনী ভিন্ন তখনকার অন্যান্য সংবাদপত্রেও তাঁর প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হত। ঐতিহাসিক তত্ত্বাবলীতে তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল এবং বিশ্বকোষের পাতা উল্টে দেখলে তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ অনেক লেখা দেখতে পাওয়া যায়।

অক্ষয়কুমার দত্ত

ইনি ছিলেন আমার সাহিত্যগুরু। ১৮৪৩ সালে তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকরূপে নিযুক্ত হন, সেই সময় থেকে আমাদের বাড়ী তাঁর যাওয়া আসা। এই কার্যে নিযুক্ত হওয়ার বিবরণ আমার পিতার আত্মচরিতে যা লেখা আছে তা এই :—

"আমি ১৭৬৫ শকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারের সঙ্কল্প করি। পত্রিকার একজন সম্পাদক নিয়োগ আবশ্যক। সভ্যদিগের মধ্যে অনেকেরই রচনা পরীক্ষা করিলাম, কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্তের রচনা আমি তাঁহাকে মনোনীত করিলাম। তাঁহার এই রচনাতে গুণ ও দোষ দুইই প্রত্যক্ষ করিলাম। গুণের কথা এই যে, তাঁহার রচনা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ও মধুর। আর দোষ এই যে, ইহাতে তিনি জটাজুটমণ্ডিত ভস্মাচ্ছাদিতদেহ তরুতলবাসী সন্ন্যাসীর প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু চিহ্নধারী বহিঃসন্ন্যাস আমার মতবিরুদ্ধ। আমি মনে করিলাম, যদি মতামতের জন্য নিজে সতর্ক থাকি, তাহা হইলে ইঁহার দ্বারা অবশ্যই পত্রিকা সম্পাদন করিতে পারিব। ফলতঃ তাহাই হইল। আমি অধিক বেতন দিয়া অক্ষয়বাবুকে ঐ কার্যে নিযুক্ত করিলাম। আমি তাঁহার ন্যায় লোককে পাইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আশানুরূপ উন্নতি করি। অমন রচনার সৌষ্ঠব তৎকালে অতি অল্প লোকেরই দেখিতাম। তখন কেবল কয়েকখানা সংবাদ পত্রই ছিল। তাহাতে লোক-হিতকর জ্ঞানগর্ভ কোন প্রবন্ধই প্রকাশিত হইত না। বঙ্গদেশে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সর্বপ্রথমে সে অভাব পূরণ করে।"

অক্ষয়বাবুর একটা উঁচু Standing desk ছিল। ঘরের মধ্যে পদচারণা করতেন আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ লিখতেন—"ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড ব্যাপার।"

তখনকার কালে অক্ষয়কুমার দত্ত আর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এঁরা বঙ্গভাষার দুই স্তম্ভ ছিলেন। যখন তাঁরা সেই ভাষা গড়ে তুললেন তা সংস্কৃতবহুল হয়ে দাঁড়াল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয়বাবু "উভয়েই সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ ও সংস্কৃত ভাষানুরাগী ছিলেন, সুতরাং তাঁরা বাঙলাকে যে পরিচ্ছদ পরালেন তা সংস্কৃতের অলঙ্কারে পরিপূর্ণ হল। অক্ষয়বাবুর লেখার আর এক নমুনা আরম্ভে দিয়েছি, আর একটি নমুনা এখানে দিচ্ছি, তা হতেই এ কথার যাথার্থ্য সপ্রমাণ হবে।

সূর্যোদয়ের বর্ণনা

"অনন্তর বিশ্বলোচন তিমিরমোচন তরুণ বিভাকর, জবাকুসুম-সদৃশী আশ্চর্যময়ী মহীয়সী মূর্তি ধারণপূর্বক, পূর্বদিকস্থিত সুরাগ-রঞ্জিত প্রবাল-মণ্ডিত সুরম্য প্রাসাদ হইতে ক্রমে ক্রমে বহির্গত হইতেছে এবং স্বকীয় সুবর্ণময় রশ্মিজাল বিকীর্ণপূর্বক, নবপল্লব-পরিবেষ্টিত সমুন্নত তরুশিখা সকল অতি মনোহর হিরন্ময় মুকুটে ভূষিত করিতেছে এই আশ্চর্য দর্শন দর্শন করিয়া ইত্যাদি।"

"১৮৪৩ হইতে ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত অক্ষয়বাবু সুদক্ষতাসহকারে তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদন কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, ইতিমধ্যে অর্থোপার্জনের কত উপায় তাঁর হস্তের নিকট এসেছে, তিনি তাহার প্রতি দৃক্‌পাতও করেন নাই। এই কার্যে তিনি এমনি নিমগ্ন ছিলেন যে, এক একদিন জ্ঞানালোচনাতে ও তত্ত্ববোধিনীর প্রবন্ধ লিখতে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইয়া যাইত, তিনি তাহা অনুভব করিতে পারিতেন না।"

"অক্ষয়বাবু আমাদের ব্রাহ্মসমাজের জ্ঞানমার্গের প্রহরীরূপে দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁহারি প্রভাবে ব্রাহ্মধর্ম অগ্রে বেদান্তধর্ম ছিল। ব্রাহ্মগণ বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস করতেন। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় এই উভয়ের প্রতিবাদ করিয়া বিচার উপস্থিত করেন। প্রধানতঃ তাঁহারি প্ররোচনাতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উক্ত উভয় বিষয়ে গভীর চিন্তা ও শাস্ত্রানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। অবশেষে বহু

অনুসন্ধান ও চিন্তার পর অক্ষয়বাবুর অবলম্বিত মত যুক্তিসিদ্ধ জানিয়া বেদান্তবাদ ও বেদের অভ্রান্ততাবাদ পরিত্যাগ করিলেন।"*

বেদোপনিষদ্ ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাভূমি হয় মহর্ষির ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল, তাঁহাকে বেদান্তধর্ম ও বেদের অভ্রান্ততা হইতে বিচলিত করিতে অক্ষয়বাবুকে বহুপ্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। পিতার আত্মচরিতে এই বিষয়ে তাঁর মনোগত ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন— "প্রথমে বেদ ধরিলাম, সেখানে ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি স্থাপন করিতে পারিলাম না তাহার পরে প্রামাণ্য একাদশ উপনিষদ্ ধরিলাম, কি দুর্ভাগ্য! সেখানেও ভিত্তি স্থাপন করিতে পারিতেছি না। তবে এখন আমাদের কি করিতে হইবে? আমাদের উপায় কি? ব্রাহ্মধর্মকে এখন কোথায় আশ্রয় দিব? বেদে তাহার পত্তনভূমি হইল না— উপনিষদেও তাহার পত্তনভূমি হইল না। কোথায় তাহার পত্তন দিব? দেখিলাম যে আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়েই পত্তন ভূমি।" * * * "উপনিষদ্ হইতেই প্রথমে আমার হৃদয়ে আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতিধ্বনি পাইয়াই আমি সমগ্র বেদ এবং সমস্ত উপনিষদকে ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা করিতে যত্ন পাইয়াছিলাম; কিন্তু তাহা করিতে পারিলাম না ইহাতেই আমার দুঃখ। কিন্তু এ দুঃখ কোন কার্যের নহে, যেহেতু সমস্ত খনিতে কিছু স্বর্ণ হয় না। খনির অসার প্রস্তরখণ্ড সকল চূর্ণ করিয়াই তাহা হইতে স্বর্ণ নির্গত করিয়া লইতে হয়।"

অক্ষয়বাবুর শেষ জীবনের কথা শাস্ত্রীমশায়ের বই থেকে এইখানে বলে এ ভাগ শেষ করি—

"ইহার পরেও অক্ষয়বাবু কয়েক বৎসর কার্যক্ষেত্রে দণ্ডায়মান ছিলেন। মধ্যে নর্মাল বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে কিছুদিনের জন্য তাহার শিক্ষকতা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রিয় তত্ত্ববোধিনীর সংস্রব একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। অবশেষে ১৮৫৬ সালের আষাঢ়

* রামতনু লাহিড়ী—পণ্ডিত শাস্ত্রী প্রণীত।

মাসে সন্ধ্যার পরে একদিন ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাতে উপস্থিত আছেন, এমন সময়ে হঠাৎ মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া যান। তখন অনেক যত্নে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন হইল বটে, কিন্তু দুই দিবস পরে একদিন তত্ত্ববোধিনীর প্রবন্ধ লিখিতেছেন, এমন সময়ে মস্তিষ্কে একপ্রকার অভূতপূর্ব জ্বালা হইয়া লেখনী ত্যাগ করিতে হইল। তদবধি সে লেখনী আর ধারণ করিতে পারেন নাই।

"ইহার পরে একপ্রকার জীবনমৃত অবস্থাতে থাকিয়াও তিনি অনেক গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। অধিক কি, তাঁহার 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' নামক সুবিখ্যাত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ এই অবস্থাতেই সঙ্কলিত। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, তিনি প্রাতঃকালে সুস্নিগ্ধ সময়ে শয্যাতে শয়ন করিয়া কোন দিন এক ঘণ্টা, কোন দিন দেড় ঘণ্টা করিয়া মুখে মুখে বলিতেন, এবং কেহ লিখিয়া যাইত ; এইরূপ করিয়া এই মহাগ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছিল।"

ধন্য তাঁর ধৈর্য ও অধ্যবসায় ! এই গ্রন্থখানি অক্ষয়কুমারের অক্ষয় কীর্তিরূপে বঙ্গসাহিত্য সমাজে চিরদিন বিরাজমান থাকিবে।

এইরূপে যখন তিনি শিরঃপীড়ায় অবসন্ন হয়ে পড়লেন, তখন তাঁর সঙ্গে আমি কাশীপুরে গঙ্গার ধারের এক বাগানে মাস দুই কাটিয়েছিলুম। কি পরিবর্তন ! আগেকার সেদিন আর নাই; সে স্ফূর্তি, সে উৎসাহ নির্বাপিত হয়েছে—সে অক্ষয় আর নাই। শরীরে তৈল মর্দন, ওজন করে ঔষধ সেবন, মাপ জোক করে আহারের ব্যবস্থা—এই প্রকার শরীর সেবাতেই দিনযাপন করতেন। সেই প্রখর জ্ঞানোজ্জ্বল চিত্ত সংশয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

"জীবনের অবসানকালে তিনি বালিগ্রামের গঙ্গাতীরবর্তী এক উদ্যান-বাটীতে থাকিয়া, এইরূপে গ্রন্থ রচনা করিতেন ; এবং অবশিষ্ট কাল উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের আলোচনা ও সমাগত ব্যক্তিদিগের সহিত জ্ঞানানুশীলনে কাটাইতেন। সেখানে ১৮৮৬ সালের ১৫ই জ্যৈষ্ঠে তাঁহার দেহান্ত হয়।"

দেবেন্দ্রসভার সভাসদ আরো অনেক ছিলেন, তাঁদের কথা বলবার আর প্রয়োজন নাই। একবার আমরা বাবামশায়ের সঙ্গে এই সব দলবল নিয়ে বরাহনগরে একটি উদ্যানে কিছুদিন যাপন করেছিলুম। সে সুখের দিন আমার স্মৃতিপটে চিত্রিত আছে। রাজা কালিকুমার ও পরিজনবর্গের আরো অনেকে তথায় উপস্থিত ছিলেন। পিতৃদেব এই দলবলে বেষ্টিত হয়ে একটি ধবল প্রস্তরাসনে বসতেন, তাঁর বর্ণনা বড়দাদার একটি কবিতায় আছে—

শুভ্রমূর্তি কান্তিমান্, শুভ্র বেশ পরিধান,
উন্নত শরীর সুগঠন,
বেষ্টিত স্বজনগণে, ধবল প্রস্তরাসনে,
বসিয়া ব্রহ্মর্ষি তপোধন।
সংসার দুর্দিনে ঝড় অসামান্য ঘোর
দিবারাত্র তাঁহার উপরে করে জোর।
অস্থির আশ্রিত গাছপালা অতিশয়,
অচল অটল তবু একই ভাবে রয়॥

এখানে আমার জীবনস্মৃতির এই একপালা সাঙ্গ হল। এখনো পাঠকদের কাছ থেকে 'আমার কথাটি ফুরলো' বলে বিদায় নেবার সময় হয়নি, পরে আর এক ভাগ আরম্ভ করা যাচ্ছে।

